ঈশ্বরের কামান

ঈশ্বরের কামান

অমরেন্দ্র দাস

শ্রীগুরু পাবলিকেশন ২৩এ, নুর আলি লেন, কলিকাতা-১৪

ঈশ্বরের কামান

সেই ঐতিহ্যময় গড় বিষ্ণুপুর

ইতিহাসের পাতায় এক একটি কাহিনী এমনি স্থান করে নেয় যে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে যায় না। তবু ইতিহাসতো মিথ্যে কাহিনী বলে না। এক সময়ে যা ঘটেছিল, সেই ঘটমান অতীতই বড় বিস্ময় জাগায়। গড় বিষ্ণুপুরের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী আজ কম দিনের নয়। এখানে যে গল্পটি বলা হয়েছে তা একটি তুচ্ছ কামানকে নিয়ে। কামান নিজে কি কখনও নিজে নিজে দাগতে পারে? কিন্তু সেই ঘটনা ঘটেছিল। বর্গীরা যখন বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেছিল। মহারাজা গোপাল সিংহ যুদ্ধ না করে সমস্ত নগরবাসীকে সঙ্গে নিয়ে গড়ের সিংহ দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আর মদনমোহন ঠাকুরের মন্দিরের সামনে সংকীর্তন শুরু করে দিয়েছিলেন। বর্গীরা যখন গড়ের সিংহ দরজা ভাঙবার চেষ্টা করে, সেই সময় সিংহ দরজার বাইরে রাখা **দলমাদল কামান** নিজেই কামান দাগতে থাকে। বর্গীরা বিস্মিত হয়। মানুষ নয় অথচ কামান নিজে কেমন করে দাগে? ঈশ্বর নিজে যদি পরিত্রাতার বেশে উদয় হন, মানুষ তার কাছে কি তুচ্ছ নয়? ইতিহাসই তা'র সাক্ষ্য দিচ্ছে।

১৭৪২ সাল। বর্গীরা সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে লুঠপাট করতে করতে বঙ্গদেশে ঢুকে পড়েছে। বর্গীদের অত্যাচারের কথা শুনে ছেলে, বুড়ো জোয়ান মদ্দ যে যেখানে আছে ভয়ে থরহরি। দিনে রাতে কেউ বাইরে বেরোনো ছেড়ে দিয়েছে। বাতাসে কেউ ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ শুনলে ঐ আসছে, ঐ আসছে বলে ঘরের মধ্যে লুকোয় কিন্তু যে লুকোয় সে জানে না, যাদের ভয়ে সে লুকোলো তারা এলে এই ঘরও আর ঘর থাকবে না। জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ঘরদোর সব মাঠ করে দেবে। আর মানুষের ছিন্নভিন্ন দেহ পথের ওপর রক্তাক্ত অবস্থায় গড়াবে

এই হল ১৭৪২ সালের ইতিহাস। বর্গীদের ভয়ে থরহরি সমস্ত বঙ্গদেশ। সে সময়ে গড় বিষ্ণুপুর সমান ঐতিহ্য নিয়ে মাথা উঁচু করে বঙ্গদেশে বিরাজ করছে। তার পুরোনো ইতিহাস খুবই ঐতিহ্যমণ্ডিত। বীর হাম্বিরের রণহুঙ্কার তখনও বাতাসে ভেসে আসে। ভয়ঙ্কর জেদী বিষ্ণুপুরের প্রাসাদ যেন সকাল, সন্ধ্যে কি এক গর্বে মাথা তুলে থাকে। বিষ্ণুপুরের মানুষও কোন ভয়ের ধার ধারে না। তাদেরও প্রাণে সাহসের অন্ত নেই। তারা বিষ্ণুপুরের প্রাসাদের পাশ দিয়ে চলতে চলতে ফিস-ফিস করে বলে, এরই ভেতরে একটি বড় বাঁধ আছে যার নাম লালবাঁধ। রাজা রঘুনাথ যুদ্ধ জয় করে লালবাঈকে নিয়ে এলে এই লালবাঁধের ধারের প্রাসাদে রেখেছিলেন। রাণী চন্দ্রপ্রভার এই পাপ সহ্য হয় নি।

সমস্ত মল্লভূমির পাপকে নিঃশেষে শেষ করার জন্যে নিজের হাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন পতিঘাতিনী হতে। সেই পতিঘাতিনী সতীর স্মৃতি নিয়ে এই লালবাঁধ চির অম্লান।

সেই বিষ্ণুপুরের ক্ষমতাতে ধূলিসাৎ করতে কে আসবে এই প্রদেশে? তবু ভয় যায় না। বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের নৃশংসতার কথা শুনে বিষ্ণুপুরও আজ চিন্তিত। বিষ্ণুপুরে যে রাজা গোপালসিংহ আজ রাজত্ব করছেন তিনি খুবই ভালমানুষ প্রকৃতির। সরল, শান্তিপ্রিয়, কোন ঝঞ্ঝাটে থাকেন না। প্রজাদের সুখের দিকে তাঁর সর্বদা লক্ষ্য। প্রজারাও তাঁর গুণগানে মুখরিত। আর রাজা নিজে ভীষণ ঈশ্বর বিলাসী। প্রাসাদের মন্দিরে যে মদনমোহন বিগ্রহ আছে সে বিগ্রহ বিষ্ণুপুর মল্লভূমির ইস্টদেবতা, যাঁর কল্যাণে এই বিষ্ণুপুরের এতো অহঙ্কার, সেই মদনমোহনের ওপর সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে রাজা গোপাল সিংহ পরম নিশ্চিন্তে আরামকক্ষে দিনযাপন করেন। কিন্তু তাঁর আরামে বাদ সেধেছে ঐ বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত। যেই শোনা গেছে বর্গীদের লক্ষ্য এই ভয়ঙ্কর জেদী এই বিষ্ণুপুর, তখন থেকেই গোপাল সিংহকে নানাজনে অতিষ্ঠ করে তুলেছে।

গোপাল সিংহ কিন্তু কোন উত্তর দিচ্ছেন না। তাকিয়ে আছেন মদনমোহন মন্দিরের দিকে।

স্তব্ধ সেই মন্দিরের দেবালয়ে অষ্টপ্রহর পূজাপাঠ হয়। মন্দির শুধু মদনমোহনের দিবানিদ্রার জন্যে একঘণ্টা বন্ধ হয়, তারপর সেই রাত্রে। এ ছাড়া সকাল সন্ধ্যা তো পূজা আছেই। সে পূজা আড়ম্বরে সমাধা করেন পুরোহিত রামলোচন শর্মা। যাদের পুরো বংশধর সেই মদনমোহনেরই পূজা করে আসছেন। আজকের সকালে সেই পূজা হচ্ছিল, প্রাসাদের ভক্তজনেরা মন্দির প্রাঙ্গনে পূজার উপাচার নিয়ে জমা হয়েছিল, এছাড়া বিষ্ণুপুরের অধিবাসীরা তো আছেই। মদনমোহনের পূজা দিতে বিষ্ণুপুরের অধিবাসীদের কোন বাধা নিষেধ নেই। তখন

প্রাসাদ ফটকওয়ালা ফটক আটকায় না। এ সেই গড় বিষ্ণুপুরের রাজত্বের শুরু থেকে চলে আসছে। মদনমোহনের অধিকার সবার। মদনমোহনকে তাই বিষ্ণুপুরের অধিবাসীরা প্রাণতুল্য ভালবাসে। কোন মানত করতে হলে এই মদনমোহনকেই করে সবাই। মদন-মোহন রক্ষা না করলে কে আর রক্ষা করবে? সেই মদনমোহনের পূজা দিতে এসে বিষ্ণুপুরের অধিবাসীরা খুবই ত্রাসের মধ্যে মন্দির দেউল তলে জমায়েত হয়েছিল। ওদিকে শঙ্খ কাঁসর নিনাদে মদনমোহনের পূজা হয়ে চলেছিল, এদিকে বিষ্ণুপুরের বাসিন্দারা আলোচনা করছিল বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতকে নিয়ে।

প্রথমজন বলল, আমাদের রাজা সরল প্রকৃতির মানুষ, যুদ্ধবিগ্রহ পছন্দ করেন না। কিন্তু বর্গীরা যে আসছে তার কি ব্যবস্থা করছেন?

দ্বিতীয়জন বলল, কি আর করবেন? রাজা ঘরে বন্ধ হয়ে আরাম উপভোগ করবেন, আর বর্গীরা আমাদের মেরে ধরে লুঠেপুটে নিয়ে চলে যাবে।

তৃতীয়জন বলল, তাই বলে আমাদের রাজা কিছু করবেন না! এ বিষ্ণুপুর মল্লভূমি। যেমন জেদী, তেমনি ভয়ঙ্কর, তার কি কোন ঐতিহ্য নেই?

নেই, নেই। সে বিষ্ণুপুর কি আর আছে? দেখছ না সৈন্যরা সব প্রাসাদ থেকে মাসোহারা নিয়ে তাস পাশা খেলে জীবন কাটাচ্ছে। এই সময়ে মন্দিরে জোরে জোরে শঙ্খকাঁসর বেজে উঠল। আর সেই সময়ে রাজা গোপাল সিংহ পট্টবস্ত্র ধারণ করে মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকলেন। তাঁর কানে গেছে বিষ্ণুপুর বাসিন্দাদের কথা কিন্তু তিনি কোন কিছু কানে না নিয়ে মদনমোহনের সামনে গিয়ে উপস্থিত হলেন। জোড়হাত করে মদনমোহনকে আরাধনা করতে লাগলেন। মৃদুস্বরে বললেন, ঠাকুর চিরকাল তুমিই এই তোমার বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করেছ। ওরা জানে না রাজ্যের রাজা কে? সেই তুমি। তোমার বিষ্ণুপুরকে রক্ষা কর। আর আমাকে যে প্রতিনিধি হিসাবে রেখেছ সব কিছু সহ্য করার শক্তি দাও।

মৃদুস্বরে এ সব কথা উচ্চারণ করলেও শুনতে কারও অসুবিধা হল না। তারা ব্যাকুল চোখে রাজার দিকে তাকিয়ে রইল। রাজার দুই চোখে অশ্রুর প্রাবল্য। তাঁর অক্ষমতা কত বেদনাদায়ক পুরবাসীরাও তা বুঝল। তারাও রাজার পাশে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত প্রস্তরময় অভয়দাতা হাস্যমুখরিত মদনমোহনকে ডাকতে লাগল। হে প্রভু, চিরকাল তুমি তো এই গড় বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করেছ। আজও বর্গীদের হাত থেকে রক্ষা কর। বর্গীরা বড় নৃশংস, তাদের প্রাণে এতটুকু দয়ামায়া নেই। তাদের হাত থেকে আমাদের মান, প্রাণ, সংসার রক্ষা কর।

রাজা গোপাল সিংহ সংশয় চিত্তে রাজজ্যোতিষী বিধুশেখরকে ডাকতে পাঠালেন। বিষ্ণুপুরের আশা আকাঙ্খার সাক্ষী পণ্ডিত বিধুশেখর এসে উপস্থিত হলেন। সম্ভ্রমে রাজা গোপাল সিংহ তাঁকে আসন নিতে বললেন। রাজজ্যোতিষী বিধুশেখর আসন গ্রহণ করলে গোপাল সিংহ বললেন, পণ্ডিতপ্রবর আপনি অনুগ্রহ করে বলুন রাজ্যের ভবিষ্যৎ কি? সে কি বর্গীদের হস্তগত হবে?

বিধুশেখর গম্ভীর হয়ে বললেন, না।

রাজা গোপাল সিংহ বহুদিন ধরে দেখে আসছেন এই জ্যোতিষ-দেবকে। এই মল্লরাজ্যে বহু ভাঙাগড়ার সঙ্গে তিনি জড়িত। এবং তাঁর গণনাও অভ্রান্ত। রাজ্য বর্গীদের হস্তগত হবে না শুনে তিনি বেশ বিস্মিত হলেন। বললেন, আপনি কি গণনার দ্বারা এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, না আপনার অনুমান?

বিধুশেখর বললেন, আপনি রাজা নিশ্চয় জানেন আমি কিছুই অনুমানের দ্বারা বলি না।

কিন্তু কি ভাবে রাজ্য রক্ষা পাবে সে তো আমি ভেবে পাচ্ছি না।

আপনি সৈন্য সাজান। যুদ্ধের জন্যে তৈরি হন। বিষ্ণুপুর কখনও কারও সঙ্গে বশ্যতা স্বীকার করে নি, এ নিশ্চয় আপনার জানা আছে।

বিধুশেখর উঠে দাঁড়ালেন। রাজা গোপাল সিংহ কিছু বলবার জন্যে মুখ তুলেছিলেন কিন্তু বিধুশেখর আর দাঁড়ালেন না।

রাজা গোপাল সিংহের প্রকৃতি যে সবার জানা এ আর গোপন
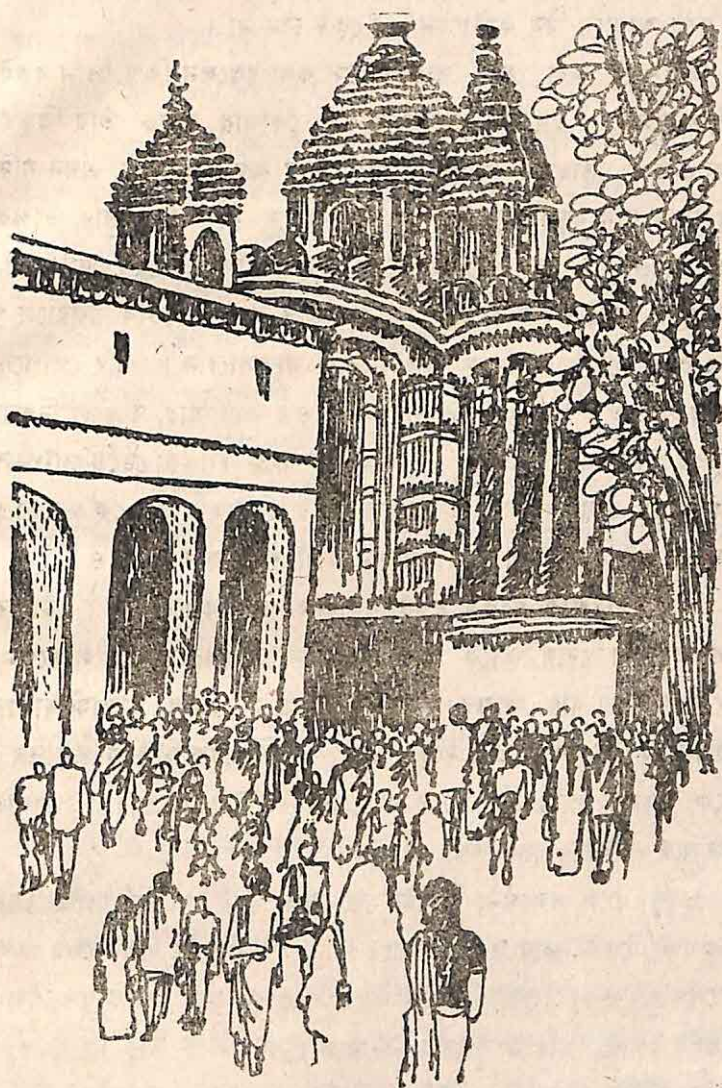
[বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দির প্রাঙ্গণ। আজও যেখানে অষ্টপ্রহর পূজাপাঠ হয়। কেউ মানত করলে সুফল পায়।]

নয়। তিনি যুদ্ধবিগ্রহ, ঝঞ্ঝাট এসব পছন্দ করেন না এ সকলেই জেনে রেখেছে। কিন্তু তাই বলে বিষ্ণুপুরের এই সমূহ বিপদে দেশের কর্ণধার চুপ করে আরামে দিন কাটাবেন এও কেউ চান না।

বিধুশেখর চলে যেতে রাজাও সে কথা বুঝলেন কিন্তু তিনি বড়ই চিন্তিত হলেন। রাজ্যের সৈন্যসামন্ত কে কোথায় আছে তাঁর কিছুই জানা নেই। তাছাড়া বহুদিন নিজেও কোন অস্ত্র ধরেন নি, এখন যদি অস্ত্র ধরতে যান বড়ই হাত কাঁপবে। সবচেয়ে রাগ হল তাঁর ভাস্কর পণ্ডিতের ওপর। বেশ তো বঙ্গদেশের অন্যত্র লুঠপাট করে বেড়াচ্ছিলে, শুনে খুবই তারিফ করা যাচ্ছিল, আবার এদিকে কেন চোখ ফেরালে? হঠাৎ রাজা গোপাল সিংহ একটা বুদ্ধি বাতলালেন। যদি গোপনে ভাস্কর পণ্ডিতকে পর্যাপ্ত উৎকোচদানে বশীভূত করা যায়, তাহলে নিশ্চয় বিষ্ণুপুর আক্রমণ করবে না। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে তাকিয়া ছেড়ে গোপাল সিংহ খাড়া হয়ে বসলেন ও চিৎকার করে ডাকলেন, এই কে আছো? খাসভৃত্য নটবর এসে দাঁড়ালে বললেন, মন্ত্রীমশাইকে খবর দাও।

কিন্তু মন্ত্রীমশাই এরকম একটা সমাধান পছন্দ করবেন না। নটবর চলে যাচ্ছিল দেখে তাকে দাঁড় করালেন, তারপর ভাবতে লাগলেন, কাকে পাঠানো যায় ভাস্কর পণ্ডিতের কাছে? হঠাৎ খাজাঞ্চীখানার একজন কেরাণীর কথা তাঁর মনে পড়ল। সুবন্ধু বেশ চালাক প্রকৃতির। তাকে ভাস্কর পণ্ডিতের কাছে পাঠালে খুবই উপকার হবে। ভাবার সঙ্গে সঙ্গে নটবরকে সেই কথা বললেন।

সুবন্ধু এলে বললেন, কথাটা তোমাকে খুবই গোপনে বলছি, যেন কাকপক্ষী কেউ জানতে না পারে। বলে নিজের কৌশলের কথা বললেন। সুবন্ধু শুনে রাজার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, মহারাজ কাজটা কি ভাল হবে?

হবে না কেন?

বিষ্ণুপুরের এতো বড় সম্মান ধূলায় ধূসরিত হবে না!

গোপাল সিংহ খুবই বিরক্ত বোধ করলেন। বললেন, সে নিয়ে কি তোমার সঙ্গে আমি আলোচনা করব? তোমাকে যা করতে বলছি

করবে কি না বলো। খোঁজ করে তুমি বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা করবে। তাঁকে আমার প্রস্তাব দেবে। তিনি রাজী হলে আমাকে এসে জানাবে।

কিন্তু যদি রাজী না হন?

গোপাল সিংহও যে একথা ভাবেন নি তা নয়। রাজী না হলে একূল ওকূল দুকূল যাবে। বিষ্ণুপুরের শক্তি তাঁর জানা হয়ে যাবে। ধ্বংসের তাণ্ডব সৃষ্টি করতে এতটুকু দ্বিধা করবেন না। একথা মনে আনতে একটু চিন্তিত হলেন। সুবন্ধুকে চলে যেতে বলে তিনি গবাক্ষ দিয়ে বিস্তৃত গড়ের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সুবন্ধু চলে গেলে রাণী সুরঞ্জনা সামনে এসে দাঁড়ালেন। এতক্ষণ তিনি সুবন্ধুর সঙ্গে রাজার সব আলোচনাই থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছেন। কাছে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, ওসব মতলব মন থেকে সরিয়ে দাও রাজা। ভুলে যেও না তুমি বিষ্ণুপুরের প্রধান। মরতে এতো ভয় পাও কেন?

গোপাল সিংহ শুধু ব্যাকুল দৃষ্টিতে রাণী সুরঞ্জনার দিকে তাকিয়ে রইলেন।

রাণী সুরঞ্জনা বললেন, আমি যে কাপুরুষের স্ত্রী নয় একথা প্রমাণ করে দাও।

তুমি কি যুদ্ধ করতে বলছ?

হ্যাঁ বলছি।

কিন্তু ওরা যে বড় নৃশংস।

আমরাও নৃশংস হব। কেন বীর হাম্বীরকে ভুলে গেলে? তাকিয়ে দেখো না সারি সারি তোমার সামনেই তোমার পূর্বপুরুষের তৈলচিত্র-গুলির দিকে। তোমার পিতৃদেব রাজা রঘুবীর শোভা সিংহকে পরাজিত করেই তো লালবাঈকে নিয়ে পালিয়ে এসেছিলেন। তাঁর কথা চিন্তা কর তো!

কিন্তু সৈন্যসামন্ত কোথায় সব তাতো আমি জানি না।

জানবার চেষ্টা কর। হুকুম কর। দেখবে সবাই জেগে উঠবে। দেশের লোক কি বলছে জানো ?

কি বলছে ?

রাজা যদি একবার জেগে উঠতেন, তাহলে আমরা সকলে বর্গীদের তাড়াতাম।

তারা একথা বলছে, কই আমি তো শুনিনি ?

তুমি শুনতে পাও নি কিন্তু বাতাসে একথা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। আমি শুনেই তো তোমার কাছে ছুটে আসছি। আমিও তো এ রাজ্যের রাণী, আমারও তো কিছু কর্তব্য আছে।

আচ্ছা একটু ভাবতে দাও, তুমি যাও।

রাণী স্বরঞ্জনা চলে গেলে রাজা গোপালসিংহ সেনাপতিকে ডাকতে পাঠালেন। তিনি এলে বললেন, দুর্জন সৈন্য সাজাও। বর্গীরা বিষ্ণুপুর আক্রমণ করলে আমরা তার মোকাবিলা করব ?

সেনাপতি দুর্জন সিংহ রাজা গোপাল সিংহের মতই অকর্মণ্য হয়ে গেছেন। গোপাল সিংহ ঘরে বসে আরাম উপভোগ করেন, দুর্জন সিংহ দীঘিতে গিয়ে মাছ ধরেন। সারাদিন বড়শি, ফাদনার দিকে তাকিয়ে বসে থাকেন, কোনদিন যে অস্ত্রশস্ত্র ধরেছিলেন সে কথা ভুলে গেছেন। যদিও রাজস্টেট থেকে বেতন পান সেনাপতি পদের, বললেন, আমরা যুদ্ধ করব ?

গোপাল সিংহ বললেন, হ্যাঁ। যুদ্ধ করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখছি না। কেন তোমার কি যুদ্ধ করার ইচ্ছে নেই ?

দুর্জনসিংহ মাথা চুলকে বললেন, না সে কথা নয়। সৈন্যসামন্ত, অস্ত্রশস্ত্র কোথায় আছে কিছু জানি না। তাছাড়া পূণাম দীঘিতে অনেক বড় কটি মাছ কদ্দিন ঘাঁই মারছে। সেগুলি ধরা না পড়লে ঠিক স্বস্তি পাচ্ছি না।

গোপাল সিংহ বললেন, মাছ ধরা ছেড়ে এখন দেশ বাঁচাও। দ্বারে শত্রু উপস্থিত।

কিন্তু হুজুর একটা নিবেদন ছিল।

বলো।

বলছিলাম কি ? বর্গীরা তো রাজ্য চায় না। সোনাদানা, হীরে-মুক্তো, টাকাকড়ি। ওদের তাই দিয়ে বিদায় করলে হয় না! শুধু শুধু লোকসান আর ঝঞ্ঝাট।

না দেশের লোক তা চায় না।

তারা কি চায় ?

তারা চায় যুদ্ধ করতে। জেদী বিষ্ণুপুরের অতীত সম্মান বজায় রাখতে।

যতসব আকাট মূর্খের দল।

কি বললে ?

কিছু না।

তাহলে যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও।

বলছিলাম কি ?

বলো।

পূণাম দীঘির মাছগুলি ধরবার পর ব্যবস্থা করলে হত না!

দুর্জন সিংহ ভুলে যেও না আমি বিষ্ণুপুরের রাজা।

দুর্জন সিংহ আর কোন কথা না বলে মুখখানি বাংলা পাঁচের মতো করে বিদায় নিলেন।

দুর্জন সিংহের কথায় সেনাদের মধ্যে আকাশ ভেঙে পড়ল। রাজ-স্টেট থেকে সেনা নামে তলব নিতে হয় বটে কিন্তু সেনা বিভাগের কাজ অনেকদিন বন্ধ হয়ে গেছে। অস্ত্রাগারের দরজায় বহুদিন তালা দেওয়া। সে তালা খোলার কথা কখনও হয় নি। দুর্জন সিংহ ছিপ ঘাড়ে নিয়েই সেনাবিভাগে এলেন, এবং তার বক্তব্য রাখলেন। বক্তব্য শুনে সৈন্যরা সেনাপতির মুখের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে রইল। তারপর দুর্জন সিংহ থামলে একজন বয়স্ক সেনা বললেন, আপনার হাতে কি সেনাপতি সাহেব, তরবারী না বর্শা ?

সেনাপতি ছিপটা কাঁধ থেকে নামিয়ে বললেন, না এটা বর্শা নয়। তোমরা ততক্ষণ সাজগোজ কর, আমি একবার পূণাম দীঘি

থেকে ঘুরে আসি। চার চারটে বড় রুই মাছ আমাকে বড় পাগল করছে।

সেনাপতি চলে গেলে সেনাদের মধ্যে বড়ই বিমর্ষ ভাব দেখা গেল। এরকম বার্তা কোনদিন তাদের শুনতে হবে কেউ একবারও ভাবেনি। সেই ভাবনায় তারা মুহ্যমান হল। কেউ কেউ রেগে বলল, বর্গীরা আর কোথাও লুঠপাট করতে পারল না। কেউ বলল, যুদ্ধ তো করব, সৈন্যের পোষাক কোথায়?

কেন সৈন্যের পোষাক তো ছিল।

সে তো ছেলের কাঁথা হয়ে গেছে।

আর একজন বলল, পোষাক না হয় না হল আসল জিনিস তো অস্ত্রশস্ত্র, সে কি ভাল আছে? মরচে ধরে সব ভোঁতা।

সে যা হয় হবে। শুনলে না রাজা যখন হুকুম দিয়েছেন তখন যুদ্ধ করতে হবে।

সর্বোদয় বাড়ী যেতে তার স্ত্রী সরলা জিজ্ঞাসা করল, কি গো তোমার কি অসুখ করেছে নাকি? মুখখানি বাংলার পাঁচের মতো।

সর্বোদয় বলল, না সমূহ বিপদ।

কি বিপদ? চাকরী গেছে?

না তার চেয়েও বিপদ।

সরলা রেগে উঠে চিৎকার করে বলল, তখন থেকে বলছ, বিপদ বিপদ, কি বিপদ বলবে তো!

যুদ্ধে যেতে হবে।

সরলা বলল, আরে আমার পোড়া কপালরে! সৈন্য বিভাগে চাকরী কর যুদ্ধে যাবে না! তা বিপদ কোথায়?

সর্বোদয় বলল, তুমি ঠিক বুঝছ না আমার অবস্থাটা। একসময়ে স্বাস্থ্য, সাহস দুই ছিল, সৈন্য বিভাগে নাম লিখিয়েছিলাম। তারপর যুদ্ধ বিগ্রহ বন্ধ হয়ে গেল, স্বাস্থ্য, সাহস দুই গেল। এখন যদি বলে যুদ্ধ করতে হবে বিপদ না।

সরলা বলল, মরণ আমার। স্বাস্থ্য, সাহস গেছে এতদিন তবে

সৈন্য বিভাগে থেকে বেতন নিচ্ছিলে কেন? মাঠে গিয়ে চাষ করতে তো পারতে।

সর্বোদয় দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, সেটাই করা উচিত ছিল, বড় ভুল হয়ে গেছে। বর্গীরা এসে যে ঝামেলা পাকাবে কে জানতো। দেখতো সৈন্যের পোষাকগুলো মাচায় আছে না সেগুলো ন্যাতা করেছ?

সরলা হেসে উঠল।

এদিকে সৈন্যদের মধ্যে সাজ সাজ রব পড়ে গেল, অস্ত্রাগার খুলে মরচে ধরা অস্ত্র বের করে শান দেওয়া হতে লাগল, কামানের জন্যে বারুদ তৈরি হতে লাগল কিন্তু রাজা গোপাল সিংহ ঠিক যুদ্ধের জন্যে মনকে প্রস্তুত করতে পারলেন না। ভয়ে আধখানা হয়ে যেতে লাগলেন। ঘরের মধ্যে বসেই ঘামতে লাগলেন। হাত পা দুর্বলতায় ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল। এই সময়ে ভাস্কর পণ্ডিতের পত্র নিয়ে দূত এসে উপস্থিত হল। পত্র পড়ে রাজা গোপাল সিংহ আরও ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন।

ভাস্কর পণ্ডিত লিখেছেন, 'আমি বিষ্ণুপুরের বাইরে ঝড়তলি ময়দানে সৈন্য নিয়ে ছাউনি গেড়েছি। আমার অভিপ্রায় কি আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন? বিনা যুদ্ধে আমার প্রাপ্য পাব, না লুঠপাট করে সব ধ্বংস করে দেব।' বর্গীদূত উত্তরের অপেক্ষায় তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, গোপাল সিংহ বললেন, কি চাই?

বর্গীদূত বলল, হুজুর উত্তর।

গোপাল সিংহ চীৎকার করে ভৃত্যকে ডাকতে লাগলেন, ভৃত্য এলে বললেন, মন্ত্রীকে ডাকো। মন্ত্রী এলে তার হাতে ভাস্কর পণ্ডিতের পত্রটা তুলে দিলেন। জবাব দাও।

মন্ত্রী পত্র পড়ে বললেন, এর আর জবাব কি দেওয়া যাবে। আমরা যুদ্ধই করব।

গোপাল সিংহ বললেন, ভাস্কর পণ্ডিতের সঙ্গে পারবে ?

পারি না পারি চেষ্টা তো করতে হবে। বিষ্ণুপুর কখনও কারও কাছে মাথা নত করেনি।

গোপাল সিংহ ভেংচে উঠলেন, ঐ অহঙ্কারেই তোমরা মরলে। বর্গীদের সঙ্গে পারবে ?

বললাম তো পারি না পারি চেষ্টা তো করতে হবে। দেশের লোক আজ সেই শপথ নিয়েছে। রাণীমাও সেই কথা বলছিলেন।

গোপাল সিংহ অসহায়ের মতো উঠলেন, এ যে মৃত্যু সে কথা বুঝেছেন।

মন্ত্রী বললেন, যুদ্ধ না করলে অপমানে মৃত্যু, যুদ্ধ করলে সম্মানে মৃত্যু। তারপর বর্গীদূতের দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাদের পণ্ডিতকে বলো আমরা প্রস্তুত, বিনা রক্তপাতে বিষ্ণুপুর কখনও অধিকার করা যাবে না বলে দিও।

বর্গীদূত চলে গেলে গোপাল সিংহ বললেন, কাজটা মন্ত্রী ভাল করলে না। ওরা তো রাজ্য চায় না, চায় কিছু ধনরত্ন, আর বিষ্ণুপুরের তোষাখানায় কম ধনরত্ন নেই, কিছু দিয়ে মিটিয়ে নিলে কি ক্ষতি হত !

উত্তর দিলেন রাণী সুরঞ্জনা, তিনি কখন এসে উপস্থিত হয়েছেন। বললেন, এইভাবে মিটিয়ে নেয় কাপুরুষেরা। অন্তত বিষ্ণুপুর কাপুরুষ নয়। তুমি না যুদ্ধ করতে চাও কর না। ঘরের মধ্যে বদ্ধ হয়ে থেকো। বর্গীদের সঙ্গে বিষ্ণুপুর মোকাবিলা করবেই।

রাজা গোপাল সিংহ কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু রাণী সুরঞ্জনা আর দাঁড়ালেন না।

বর্গীদূতের মুখে বিষ্ণুপুরের আস্ফালন শুনে ভাস্কর পণ্ডিত গম্ভীর হলেন। ভেবেছিলেন বিষ্ণুপুর আক্রমণ না করলেই তাঁর পাওনা তিনি পেয়ে যাবেন। রাজা গোপাল সিংহের স্বভাব চরিত্রের খোঁজ তিনি নিয়েছিলেন।

বর্গীদূতের দিকে তাকিয়ে বললেন, বিষ্ণুপুরের রাজা একথা বললেন !

না হুজুর তিনি আমাদের ধনরত্ন দিয়ে মিটিয়ে নিতে চেয়েছিলেন।

তবে !

তাঁর মন্ত্রী বললেন, বিষ্ণুপুর বিনা রক্তপাতে কিছু দেবে না।

ভাস্কর পণ্ডিত পাশে একজন স্থূলকায় সহকারীর দিকে তাকিয়ে বললেন, জঙ্গম সৈন্যদের ছাউনি তুলতে বলো। বিষ্ণুপুর আক্রমণ করব।

জঙ্গম তাস খেলছিল একা একা। রং মেলাতে মেলাতে বলল, পাগল। এখন ছাউনি তুলতে বলে রাস্তায় পড়ে মারা যাই।

কেন ?

পণ্ডিত কি ভুলে গেছ এটা কৃষ্ণপক্ষ। এক পক্ষকাল আমাদের এই ঝড়তলিতে কাটাতেই হবে। তাছাড়া বিষ্ণুপুর আক্রমণ করতে গেলে একটু বুঝে শুনে এগোতে হবে।

কারণ ?

বিষ্ণুপুরের গড় পরিখা আমি দেখে এসেছি। সাততলা সমান উঁচু। আর পরিখার বাইরের খাদ ভীষণ চওড়া আর জল ভরা। সেই খাদে আবার বড় বড় কুমীর আছে।

তার জন্যে কি আমরা ভয় পাব ?

না ভয় কেন পাব ! তবে মাথা ঠাণ্ডা করে এগোতে হবে। আর বিষ্ণুপুরের বাসিন্দারাও ভীষণ অহঙ্কারী। একজনকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, হ্যাঁ ভাই এখানকার লোকসংখ্যা কত ? সে কি বলল জানো ?

কি ?

এখানকার লোকসংখ্যা অগুণতি।

মানে !

সে বলল, মানে বুঝলেন না কর্তা। অনেক সংখ্যা তো মায়ের পেটে আছে সেগুলি কি করে গুণবো ?

খুব স্পর্দ্ধা তো !

আরও আছে। জিজ্ঞাসা করলাম, তোমাদের এখানে অতিথিদের কিরকম সেবা করা হয়।

সে বলল, রাজ প্রাসাদে অতিথিশালা আছে সেখানে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেই উত্তর পাবেন।

ভাস্কর পণ্ডির দাঁত কড়মড়িয়ে বললেন, ব্যাটার জিবটা টেনে বের করে আনলে না কেন?

জঙ্গম বলল, সেইজন্যে তো বলছি, বিষ্ণুপুর আক্রমণ করতে গেলে একটু বুঝে সুঝে এগোতে হবে। আরও একটা কারণ লক্ষ্য করেছি, সমস্ত বিষ্ণুপুরের লোকেরা ওদের উপাস্য দেবতা মদনমোহনকে খুব ভক্তি শ্রদ্ধা করে।

মদনমোহন কোথায় থাকে?

ভাস্কর পণ্ডিত এমন করে কথা বললেন, জঙ্গম হেসে ফেলল, বলল, মদনমোহন কোন মানুষ নয় পাথরের ঠাকুর। থাকে প্রাসাদের ভেতরে বিরাট এক মন্দিরে। প্রত্যহ অষ্টপ্রহর সেখানে পূজা হয়। এই ঠাকুরই নাকি বিষ্ণুপুরের সমস্ত অহঙ্কারকে ধরে রেখেছে।

ওসব ঠাকুর টাকুর আমি মানি না। বিষ্ণুপুর প্রাসাদ অধিকার করে আগেই পাথরের ঠাকুরকে জলে চুবিয়ে মারব।

ভাস্কর পণ্ডিতের কথা শুনে জঙ্গম তাস সাজাতে সাজাতে মৃদু মৃদু হাসতে লাগল।

ভাস্কর পণ্ডিত বললেন, হাসছ কেন জঙ্গম?

জঙ্গম তবু হাসতে লাগল। ভাস্কর পণ্ডিত রেগে উঠলেন ওর হাসিতে।

চড়া রোদের চড়া আলো পূণাম দীঘির ওপর ছড়িয়ে পড়েছিল। সেনাপতি দুর্জন সিংহ মালকোচা মারা কাপড় পরে আদুল গায়ে ছিপ ফেলে ফদনার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন। তাঁর গৌরবর্ণ বিশাল দেহ বেয়ে ঘাম নেমে চলেছিল। কিন্তু সেদিকে তাঁর লক্ষ্য নেই, লক্ষ্য

তার জলের দিকে। বিশাল দীঘির এপার ওপার দেখা যায় না। মাঝে মাঝে জলে বুজবু'ড় কাটছে। ছিপের কাছে লেজের ঝাপটা মেরে মাছ জলের তলায় তলিয়ে যাচ্ছে। সেই মাছ এমনি কাণ্ড করছে সেনাপতি দুর্জন সিংহের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে কিন্তু বড়শির কাছে মাছের যাওয়ার কোন তাড়া নেই। ফাদনা আর নড়ে না।

সেনাপতি দুর্জন সিংহ যখন এমনি তন্ময় তার পিছনে একটি ছায়া এসে দাঁড়াল। সে ছায়া ভাস্কর পণ্ডিতের সহকারী জঙ্গমের। জঙ্গমের পোষাক সৈন্যের। মহারাষ্ট্রীয় সৈন্যের পোষাকের চেকনাই বড় চমৎকার। জঙ্গম স্থির হয়ে দুর্জন সিংহের পিছনে দাঁড়িয়ে মাছ ধরা দেখছিল। হঠাৎ তন্ময়তা কেটে গেল।

ফাদনা ডুবেছে। সেনাপতি বড়শিতে টান মেরে পিছু হটতে গিয়ে জঙ্গমের গায়ে ধাক্কা লেগে উলটে গেলেন। মাছও পালিয়ে গেল, সেনাপতিও খুব বিরক্ত হলেন কিন্তু জঙ্গমের বিশাল সৈনিক চেহারা দেখে অবাক হলেন।

কিন্তু জঙ্গম বেশ মোলায়েম ব্যবহার করল, কাচুমাচু হয়ে বলল, আমার জন্যেই মাছটা পালিয়ে গেল বন্ধু, আমাকে ক্ষমা করে দাও।

দুর্জন সিংহ খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন কিন্তু এমন অপরিচিত ও বিশাল শক্তিশালী সৈনিকের মুখে মধুর কথা শুনে খুব প্রীত হলেন, বললেন, না না ঠিক আছে। কিন্তু আপনাকে তো ঠিক চিনতে পারলাম না!

যদিও পূণাম দীঘি ঝড়তলি ময়দান থেকে বেশি দূর নয়। আর সেখানে যে বর্গীরা ছাউনি গেড়েছে সে কথা সেনাপতি দুর্জন সিংহ জানেন। জঙ্গম বলল, আমার পোষাক দেখে নিশ্চয় অনুমান করেছ আমি এক সৈনিক কিন্তু কোন দলের নই। দলভুক্ত হবার জন্যে চাকরী খুঁজছি। দূরে বর্গীদের ছাউনি দেখিয়ে বলল, ওখানে গিয়েছিলাম চাকরীর সন্ধানে কিন্তু কে এক ওদের সেনাপতি পণ্ডিত এমন চড়াগলায় ভাগিয়ে দিল যে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল।

সেনাপতি দুর্জয় সিংহ এমনি এক বিশাল সৈনিক পুরুষ চাকরী খুঁজছে শুনে খুবই খুশি হলেন, বললেন, আপনি ভাই একটু দাঁড়ান,

আমি ছিপটা গুটিয়ে নিই। চাকরী আপনাকে আর অন্য কোথাও খুঁজতে হবে না। বিষ্ণুপুরের নাম শুনেছেন ?

জঙ্গম বলল, হ্যাঁ, হ্যাঁ, খুব তার নাম আছে।

সেই বিষ্ণুপুর রাজস্টেটের আমি সৈনিক সেনাপতি। আমিই আপনাকে চাকরী দেব।

জঙ্গম আহ্লাদে বলল, তাহলে আমি ঠিক লোকের দেখা পেয়ে গেছি। দুর্জন সিংহের জল থেকে তখন ছিপ তোলা হয়ে গেছে। জঙ্গম বলল, আমার জন্যেই আপনি মাছ ধরা বন্ধ করে দিলেন তার চেয়ে এক কাজ করুন না, আমি আপনার পাশে কিছুক্ষণ বসি আপনি মাছ ধরতে থাকুন।

দুর্জন সিংহ ছিপ গুটিয়ে মাছের মশলার মোড়কগুলি তুলতে তুলতে বললেন, এখন যে রাজ্যের আমাদের অবস্থা তাতে মাছ কেন কিছুই ধরা উচিত নয় কিন্তু কি করব চারটে মাছ কদিন ধরে দীঘিতে এমন ঘাই মারছে যে না এসে পারছি না।

জঙ্গম কিছু জানে না এমনিভাবে মুখ করে বলল, রাজ্যের কি বিপদ ?

দুর্জন সিংহ দূরে বর্গী ছাউনি দেখিয়ে বলল, ঐ যে মহারাষ্ট্র ডাকু ভাস্কর পণ্ডিত, সে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করে লুটপাট করতে চায়।

বলার সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গম লাফিয়ে উঠল, ঐ পণ্ডিত লোকটা খুব বদমাইস, দাঁড়াও বন্ধু আমি এখুনি ওর বারটা বাজিয়ে আসছি। বলে সে কোমরে গোঁজা ঝকঝকে ছোরাটা বের করে কয়েক পা এগিয়ে গেল, আজই জান ছিনে নেব। আমায় কম অপমান করেছে। হতে পারি বেকার, তাবলে কমজোরী নয়।

কিন্তু যেতে পারল না। দুর্জন সিংহ খপ্ করে হাত ধরে ফেললেন, বললেন, ধীরে বন্ধু, অতো অস্থির হয়ো না। মনে মনে বললেন, মদনমোহন ঠিক লোকই পাঠিয়ে দিয়েছেন। বিষ্ণুপুর তিনি রক্ষা না করলে কে আর রক্ষা করবে ? মুখে বললেন, তাহলে বিষ্ণুপুরের সেনাবিভাগের চাকরী তো তুমি নিচ্ছ !

নিচ্ছি মানে ? তুমি বন্ধু আমাকে বেকার অবস্থা থেকে বাঁচালে। আমি যে তোমাকে কি বলে ধন্যবাদ দেব।

সেনাবিভাগের লোকজনও জঙ্গমের বিশাল চেহারা দেখে অবাক হয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে তার শক্তির পরীক্ষাও শুরু হল। সবচেয়ে শক্তিমান বল্লভের সঙ্গে অসির যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। উমুক্ত স্থানে দুই প্রধানের বিরাট ঘোরতর যুদ্ধ।

বল্লভ যত পাঁচ মারে, যত মেহনত করে, জঙ্গম সহজভাবে সে সব পাঁচ প্রতিহত করে। এক সময়ে বল্লভ ক্লান্ত হতে জঙ্গম এক ঘায়ে তার হাত থেকে অসি মুক্ত করল। বুকের কাছে সূচারু ফলা ধরে বলল, এবার শেষ করে দিই !

বল্লভ ভয়ে কেঁপে উঠল কিন্তু জঙ্গম হেসে বলল, না তুমি আমার বন্ধু, তুমি বিষ্ণুপুরের শক্তি, তোমাকে বধ করলে বিষ্ণুপুর একটি শক্তি হারাবে। বলে বল্লভকে বুকে জড়িয়ে ধরল।

যারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই শক্তি পরীক্ষা দেখছিল, তারা জঙ্গমের উদার মনের পরিচয় পেয়ে ধন্য ধন্য করে উঠল।

সেনাপতি দুর্জন সিংহ এগিয়ে এসে জঙ্গমকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, সাবাস জঙ্গম। তারপর নিজেই আনন্দে ধ্বনি দিয়ে উঠলেন, জয় বিষ্ণুপুরের জয়, জয় মদনমোহন জিউকীর জয়। সেনাপতি দুর্জন সিংহের সঙ্গে অগণিত সেনাও গলা মেলাল। সে গলা সারা গড়ে প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল।

রাজা গোপাল সিংহের কানেও সে প্রতিধ্বনি গেল, তিনি পাশে উপবিষ্ট রাণী সুরঞ্জনাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিসের প্রতিধ্বনি রাণী, বিষ্ণুপুর কি বর্গীদের হটালো ?

রানী সুরঞ্জনা মদনমোহনের জন্যে মালা গাঁথছিলেন, বললেন না দুর্জন সিংহ একটি নতুন পরদেশী শক্তিমান সৈনিক পেয়েছেন, সেইজন্য এতো উল্লাস।

গোপাল সিংহ আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলেন, এই সময়ে দুর্জন সিংহ সঙ্গে করে জঙ্গমকে নিয়ে ঢুকলেন।

জঙ্গম ঢুকেই রাজা ও রানীকে অভিনন্দন করল এবং হাঁটু মুড়ে বসে নতজানু হয়ে বলল, আপনারা অহঙ্কারী বিষ্ণুপুরের অতি সম্মানীয় রাজা ও রানী। আজ থেকে আমি আপনাদের গোলাম, আপনাদের যদি কোন আজ্ঞা থাকে বলুন।

গোপাল সিংহ সেনাপতির মুখের দিকে তাকিয়ে সর্ব বৃত্তান্ত জানতে চাইলেন। শুনে তিনি মনে খুবই বল পেলেন। জঙ্গমের দিকে তাকিয়ে বললেন, পারবে ঐ ভাস্কর পণ্ডিতকে বধ করতে? জঙ্গম কোমর থেকে অসি নিষ্কাসন করে উঁচুতে তুলে বলল, শরীরে একবিন্দু রক্ত থাকা পর্যন্ত আমি চেষ্টা করব।

রানী সুরঞ্জনা সপ্রশংস দৃষ্টিতে জঙ্গমের দিকে তাকিয়ে দুর্জন সিংহের কাছ থেকে অনেক কথা জেনে নিলেন। একটা লোক যে কত বল সঞ্চার করতে পারে, কত দুর্ভাবনা কাটিয়ে দিতে পারে জঙ্গমই তার প্রমাণ। পরম নির্ভরতায় মনে মনে রানী সুরঞ্জনা ও মদন-মোহনকে আর একবার প্রণাম জানালেন। হে ঠাকুর, তোমার বিষ্ণুপুর তুমিই তো চিরকাল রক্ষা করে এসেছ।

এই আলাপ আলোচনার মধ্যে সন্ধ্যারতির শাঁখঘণ্টা বেজে উঠল। রাজা গোপাল সিংহ উঠে দাঁড়ালেন বললেন, চলো জঙ্গম, মন্দিরে যাই। তুমি আমাদের মদনমোহনকে দেখেছ?

জঙ্গম মাথা নেড়ে বলল, সে সৌভাগ্য এখনও আমার হয়নি রাজা, তবে শুনেছি বিষ্ণুপুরের সবচেয়ে বড় যোদ্ধা ঐ মন্দিরে আছেন।

রাজা জঙ্গমের কথা শুনে হেসে উঠলেন, খুব ভাল কথা বললে তো জঙ্গম। যোদ্ধাই বটে। শুধু যোদ্ধা নয় মদনমোহনই তো এই বিষ্ণু-পুরের রাজা।

মনে মনে জঙ্গম বলল, সেই বড় যোদ্ধাকে দেখবার জন্যেই তো এতো মেহনত করে এই গড়ের মধ্যে প্রবেশ করেছি।

মন্দিরে সন্ধ্যারতি হচ্ছিল। সেখানে জমায়েত হয়েছিল অগণিত

ভক্ত। রাজা রাণী ঢুকতে সকলে সরে দাঁড়াল। রাণী মন্দিরের ভেতরে ঢুকে গেলেন। প্রত্যহ নিজের হাতে একটি মালা গেঁথে তিনি মদনমোহনকে পরান। এ আবাহনকাল থেকে চলে আসছে। বিষ্ণুপুরের সব রাণীরা এই মালা দান করে এসেছেন। রাণী সুরঞ্জনাও তাই করেন।

রাজা দাঁড়িয়ে রইলেন মন্দিরের দরজার সামনে। দৃষ্টিতে ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি, ধীরে দু চোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। দুর্জন সিংহের পাশে দাঁড়িয়ে জঙ্গমও দেখছিল মদনমোহনের প্রশান্ত মূর্ত্তি। তার দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ণ। শুনেছে এই মদনমোমাহন খুবই জাগ্রত। এর পুষ্পাঞ্জলি সঙ্গে নিয়ে রাজারা যুদ্ধে গেলে যুদ্ধ জয় করে ফেরেন। কিন্তু কিছুই এমন বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ল না পাথরের একটি সুন্দর মূর্ত্তি। হঠাৎ জঙ্গম সেই মূর্ত্তির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ শরীরে কেমন রোমাঞ্চ অনুভব করল। মদনমোহনের দৃষ্টিতে যেন তীব্র ভ্রূকুটি। আর সে তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে জঙ্গমের দিকে। হঠাৎ তার চোখ দুটি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে আগুনের ফলা এসে জঙ্গমকে বিদ্ধ করতে লাগল।

জঙ্গম অনুভব করল, তার চাতুরী এই পাথরের ঠাকুরের কাছে গোপন নেই। তার শরীর জ্বলতে লাগল। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, উফ।

তারপর পিছু ফিরে দৌড় লাগাল। যতদূরে যায় যেন তার মনে হল সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সূক্ষ্ম অগ্নিফলা তার পিছুতে পিছুতে আসছে। সে দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ফটক পার হয়ে ছুটতে লাগল। ফটকওয়ালা চিৎকার করে উঠল, এই কৌন হায় রে?

ভাস্কর পণ্ডিত জঙ্গমের মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বসেছিলেন। তখনও তার জ্ঞান ফেরেনি। বৈদ্য দেখে গেছে, বলে গেছে ভয় নেই হঠাৎ কোন আতঙ্কে জ্ঞান হারিয়েছেন। ভাস্কর পণ্ডিত অবাক হয়ে

জঙ্গমের মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবছিলেন, কি এমন আতঙ্কে জঙ্গম জ্ঞান হারাল। সে তো খুব একটা দুর্বল মনের লোক নয়!

এই সময়ে জঙ্গমের জ্ঞান ফিরতে ভাস্কর পণ্ডিত হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। জঙ্গম চোখ মেলে তখনও সেই মদনমোহনের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেখতে পাচ্ছিল। একবার শিউরে উঠতে ভাস্কর পণ্ডিত বললেন, কি ব্যাপার তুমি কি কোন অপদেবতার নজরে পড়েছিলে? জঙ্গম জবাব দিল না, তারপর এক সময়ে সে সহজ অবস্থায় উঠে বসল।

ভাস্কর পণ্ডিত জিজ্ঞাসা করলেন, সারাদিন ধরে কোথায় ছিলে? আর ফিরলেও তো এক আতঙ্ক নিয়ে।

জঙ্গম সুস্থ হতে আরও কিছু সময় নিল। তারপর বলে গেল সারাদিনের কাহিনী।

এই জঙ্গমই ভাস্কর পণ্ডিতের প্রধান সহকারী। তার বুদ্ধি, বিবেক, শক্তির ওপর যথেষ্ট শ্রদ্ধা ভাস্কর পণ্ডিতের। এ পর্যন্ত যত অভিযান ভাস্কর পণ্ডিত করেছেন তার সব সাফল্য একরকম জঙ্গমের বুদ্ধির দ্বারা হয়েছে। সেইজন্যে সারাদিনের কাহিনী শুনে জঙ্গমকে সাবাস দিয়ে উঠলেন, বললেন জঙ্গম আমাকেও তো এইসব একবার দেখতে হবে। একটা পাথরের ঠাকুর তোমাকে দৃষ্টি দিয়ে পুড়িয়ে মারল। এ আমি বিশ্বাস করি না।

জঙ্গম বলল, আমিও কি বিশ্বাস করেছি কিন্তু কি যে হয়ে গেল কিছুই বুঝতে পারলাম না।

ভাস্কর পণ্ডিত মুচকে মুচকে হাসতে হাসতে বললেন অ বুঝেছি আমাদের জঙ্গম সর্দারকে কোন অপদেবতা ভয় করেছিল। জঙ্গম গুম হয়ে রইল।

ভাস্কর পণ্ডিত কথা পালটাবার জন্যে বললেন, সেনাপতি দুর্জন সিংহও কি রাজা গোপাল সিংহের মতো বোকা লোক?

জঙ্গম বলল, তা না'হলে দ্বারে শত্রু সে দীঘিতে বসে মাছ ধরে!

জঙ্গম আমার বড় ইচ্ছে করছে তোমার চেলা হয়ে একবার বিষ্ণুপুর গড়ের মধ্যে ঢুকি।

মতলব ?

তুমি তো এখন বিষ্ণুপুর রাজস্টেটের বেতন ভোগী সৈনিক। আমাকেও তোমার সাগরেদ করে নাও।

কিন্তু পণ্ডিত তোমাকে চিনে ফেললে যে সমূহ বিপদ হবে।

চিনবে কেমন করে ?

জঙ্গম ভাস্কর পণ্ডিতের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে তারপর বলল, তোমার স্বভাব তো ভাল নয়, যদি কিছু গোলমাল করে ফেলো।

গোলমাল বলতে ?

হয়ত ভালমানুষ রাজাকে দেখে তার বুকে ছুরি ঢুকিয়ে দিলে।

ভাস্কর পণ্ডিত হাঃ হাঃ করে অট্টহাস্য হেসে উঠে বললেন, অতো বোকা ভেবো না জঙ্গম সর্দার। ভাস্কর পণ্ডিত গোঁয়ার হতে পারে তবে অবিবেচক নয়।

তাহলে ঠিক আছে আমার সাকরেদ হয়েই চলো প্রাসাদে যাই। কৃষ্ণপক্ষ না যাওয়া পর্যন্ত তো বিষ্ণুপুর আক্রমণ করা যাবে না।

পূর্ণাম দীঘির ধারে সেদিনও সেনাপতি দুর্জন সিংহ মাছ ধরছিলেন। তবে আজ একটা ইয়া বড় রুই মাছ ধরেছেন। সেটি ঘাসের ওপর শোয়ানো আছে। চড়া রোদের আলো মেঘের মতো গলে গলে প্রান্তরের ওপর পড়ছে। ঘসা কাঁচের মতো মেঘের বর্ণ। নিস্তব্ধ চারিদিক। শুধু গাছপালার ভেতর থেকে পাখীদের কিচির মিচির ভেসে আসছে। দুর্জন সিংহ তন্ময়। ছিপের ফাদনার দিকে দৃষ্টি তাঁর। পিছনে দুটি ছায়া পড়ল কিন্তু দুর্জন সিংহ বুঝতে পারলেন না। পিছনে দাঁড়িয়ে ভাস্কর পণ্ডিত চাপাস্বরে জঙ্গমকে বললেন, দেব পিছন থেকে গলাটা টিপে! বিষ্ণুপুরের সেনাপতির প্রাণ খাঁচা ছাড়া হয়ে যাবে।

জঙ্গম ইসারায় নিবৃত্তি করল ভাস্কর পণ্ডিতকে। হঠাৎ গলাখাঁকারি দিয়ে বলল, এই যে বন্ধু আজও মাছ ধরছ ?

দুর্জন সিংহ ঘুরে দেখতে গিয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে দেখলেন, জঙ্গমের

চেয়ে চেহারায় ভাস্কর পণ্ডিত আরও লম্বা, চওড়া ও শক্তিশালী। গোঁফ জোড়াটি এতই বাহারে যে ওস্তাদ ছাড়া কিছু ভাবা যায় না। দুর্জন সিংহের দৃষ্টির অর্থ চালাক জঙ্গম পড়ে নিয়ে তড়বড়িয়ে বলল, বন্ধু আমার এই সঙ্গীর সঙ্গে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব বলে ছুটতে ছুটতে আসছি।

দুর্জন সিংহ তখনও তাকিয়ে রইলেন ভাস্কর পণ্ডিতের তীক্ষ্ণ চেহারার দিকে। জঙ্গম বলল, এও আমার মতো চাকরীর সন্ধান করে ফিরছে। একেও একটা আমার মতো চাকরী দেবে?

দুর্জন সিংহ সেই মুহূর্তে এই কথাটিই ভাবছিলেন, জঙ্গমের মতো এও যদি বিষ্ণুপুর সেনাবিভাগে আসে, তাহলে সেনাবিভাগ অনেক জোরদার হয়ে। কিন্তু মুখে বললেন, জঙ্গম কাল মন্দির থেকে কোথায় গেলে একদম তো খুঁজে পেলাম না।

আর বন্ধু সেই কথাই বলবার জন্যে তো তোমায় খুঁজছিলাম, কাল যখন মদনমোহনের আরতি দেখছিলাম, ফটকওয়ালা ডাকতে পাঠাল, গিয়ে দেখি এই আমার সঙ্গী। একেও ঐ বর্গীসর্দার ভাস্কর পণ্ডিত খুব অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে। ভীষণ গরম খেয়ে আমার কাছে এসেছিল বদলা নেবে বলে। তারপর দুজনে মিলে বর্গী তাঁবুতে গিয়ে খুব অত্যাচার করেছি।

কি অত্যাচার করলে? দুর্জন সিংহ আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

কেন রাত্রিবেলা গড় থেকে দেখনি, ঝড়তলি ময়দানে কিরকম আগুন জ্বলছিল।

দুর্জন সিংহ কিছুই দেখেননি, তবু বললেন, সে আগুন তো ওদের রান্নাবান্নার মনে হয়েছিল।

না না, জঙ্গম দু'হাতে তালি বাজিয়ে বলল, তিনখানা তাঁবু আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছি। আর দুটো জোয়ান লাশ। ভাস্কর পণ্ডিতকে খুঁজছিলাম কিন্তু লোকটা এমন আহাম্মক, পালিয়ে বেঁচেছে।

দুর্জন সিংহ খুশি হয়ে বললেন, তোমার এ সঙ্গীর নাম কি?

সঙ্গম।

বাহ্ বেশ দুজনের নামের মিল আছে তো !

সে থাকবে না কেন ? আমরা তো একেই দিনে জন্মেছি। একই মায়ের কোলে বড় হয়েছি, শুধু দুজনের মা আলাদা বলে ভাই না হয়ে বন্ধু হয়েছি।

ভাস্কর পণ্ডিত মনে মনে তারিফ করলেন জঙ্গমের। এমন বুদ্ধি না হলে বর্গীসর্দারের সাকরেদ।

এই সময়ে দুর্জন সিংহ জিজ্ঞাসা করলেন, তাহলে সঙ্গম তুমি আমাদের সেনাবিভাগের চাকরী নেবে তো !

সঙ্গমের জায়গা জঙ্গমই বলল, নেবে না মানে ? পেলে বর্তে যাবে। আমাকে তো আসবার সময়ে বলছিল, সেনাপতি সাহেব কি আমাকে পছন্দ করবেন ? আমি বললাম, তুমি সেনাপতি সাহেবকে চেনো না, তার মতো ভালমানুষ এই বিষ্ণুপুরে একজনও নেই।

খোসামোদে সবাই খুশি হয়, দুর্জন সিংহও হলেন, বললেন, একটু দাঁড়াও ভাই তোমরা, ছিপটা গুটিয়ে নিই।

জঙ্গম বলল, তার চেয়ে বন্ধু এক কাজ কর না, আমরা ঐ গাছ-তলায় একটু বসি, তুমি আর একটা মাছ ধরে নাও। কত বড় মাছ ধরেছ আজ। কিন্তু সেনাপতি সাহেব তোমার বাড়ীতে আজ আমরা দুজন খাব।

দুর্জন সিংহ বললেন, আরও তিনটে মাছ এখনও আছে। তিনটে না ধরা পর্যন্ত শান্তি নেই। তারপর ভাস্কর পণ্ডিতের দিকে তাকিয়ে বললেন, বর্গীদের তাঁবু জ্বালালে ঐ ভাস্কর পণ্ডিতকে বধ করতে পারলে না ?

ভাস্কর পণ্ডিত বললেন, আপনার রাগ বুঝি ভাস্কর পণ্ডিতের ওপর খুব।

খুব মানে ? সে বিষ্ণুপুর আক্রমণ করতে এসেই তো আমাদের সমস্ত জীবন অশান্ত করে তুলল।

অশান্ত কেন ? রাজ্য তো শত্রু আক্রমণ করেই। শত্রুর সঙ্গে মোকাবিলা করতে হয়।

সে যারা করে করে। আমাদের রাজা খুব সরল মানুষ। বলতে গেলে ভীতু প্রকৃতির।

সে রাজাকে গদিচ্যুত করা উচিত। আপনার তো খুব সাহস আছে, রাজাকে মেরে সিংহাসনে বসতে পারেন না ?

দুর্জন সিংহ চমকে উঠে বললেন, তুমি আমাকে বিশ্বাসঘাতক হতে বলছ ?

বিশ্বাসঘাতকতার কি আছে ? এই ভাবেই তো রাজ্য জয় করতে হয়। সেনাপতির মনে কি যেন চিক চিক করে উঠল. রাজপ্রাসাদটা বোধ হয় ঝলসে উঠল মনে। কিন্তু লোভ সংবরণ করে মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, এ রাজ্য অন্য কারও অধিকার করার সাধ্য নেই। বীর হাম্বীরের বংশধর যারা, তারা ছাড়া এ রাজ্য কেউ ভোগ করতে পারে না।

করলে ?

করলে মদনমোহন ঠাকুর তার সর্বনাশ করবে ?

আমি বিশ্বাস করি না। ভাস্কর পণ্ডিত মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন।

দুর্জন সিংহ বললেন, তুমি মদনমোহনকে দেখেছ ?

না।

ঠিক আছে দেখতেই পাবে। দেখলে বুঝবে এ রাজ্যের সত্যিকারের রাজা যদি কেউ হয় সে হল মদনমোহন জিউ।

ভাস্কর পণ্ডিত ঠোঁট মুচড়ে হেসে উঠলেন।

সেনাবিভাগের লোকেরা জঙ্গমকে দেখেছে। জঙ্গমের শক্তিকে তারা শ্রদ্ধা জানিয়েছে। সঙ্গমকে দেখেও খুশি হয়ে উঠল।

দুর্জন সিংহ বললেন, আজ থেকে সঙ্গমও আমাদের সেনাবিভাগে বহাল হল। এই দুজন নতুন শক্তিশালী বন্ধু পেয়ে আমাদের সেনাবিভাগ জোরদার হল। বর্গী আক্রমণে আমরা আর ভয় পাব না।

ভাস্কর পণ্ডিত জঙ্গমের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। জঙ্গম শুধু সতর্ক করে দিল।

তারপর সেখানে ভাস্কর পণ্ডিত ও জঙ্গমকে বেষ্টন করে সেনাদের মধ্যে নানান আলোচনা বসল। ভাস্কর পণ্ডিত কেমন দেখতে? তাদের চেয়ে আরও বিশাল নাকি? লোকটি খুবই নৃশংস প্রকৃতির। মানুষকে মানুষ বলে জ্ঞান করে না।

এসব কথা ভাস্কর পণ্ডিতকেই জিজ্ঞাসা করা হচ্ছিল, ভাস্কর পণ্ডিত কৌতুকে গোঁফ মুচড়ে বললেন, আরও কি কি ভাস্কর পণ্ডিতের ক্ষমতা আছে?

সেনারা বলল, তুমি হাসছ কেন ভাই, তুমি কি ভাস্কর পণ্ডিতকে দেখেছ নাকি?

বল না লোকটার সম্বন্ধে তোমরা আর কি কি জানো?

জানি না কিছুই, তবে খুব ত্রাস তাকে নিয়ে। তার কথা শুনলে মায়ের কোলে শিশুও ভয়ে কেঁপে ওঠে। কেন সেই গানটা শোননি?

'ছেলে ঘুমোলো পাড়া জুড়োলো
বর্গী এল দেশে।
ছোট পাখীতে ধান খেয়েছে
খাজনা দেব কিসে।'

ভাস্কর পণ্ডিত গানটা শুনে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন, বাহ বেশ গান তো! খাজনা দেবার পয়সাই নেই লোকের!

জঙ্গম পাশে বসা ভাস্কর পণ্ডিতকে চিমটি কেটে সতর্ক করে দিল।

সেনারা বলল, আমরা তার কথা আলোচনা করে ভয় পাই, তুমি একটুও ভয় পাচ্ছ না, তুমি কি তাকে দেখেছ? ভাস্কর পণ্ডিত একবার জঙ্গমের দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বললেন, দেখেছি মানে কি? তার সামনে বসে তার সঙ্গে তুমুল ঝগড়া করেছি বলো।

সেনারা অবাক হয়ে বলল, তাই নাকি? তারপর!

তারপর আর কি! লোকটা যতই ভয়ঙ্কর তোমরা ভাবো আমি তো তাকে খুব বোকা ভাবলাম।

বোকা ভাবলে ?

হ্যাঁ বোকা ছাড়া আর কি ? শুধু গায়ের জোরে অত্যাচার করা যায় বটে। বুদ্ধি না থাকলে রাজ্য জয় করা যায় না। তোমরা তো শুনেছ লোকটা খুব মানুষ মারে কিন্তু একটা দেশ জয় করেছে দেখেছ ?

না না তা দেখিনি।

তবে ? আসলে লোকটার একদম বুদ্ধি নেই। না'হলে আমরা যে তার তিনটে তাঁবু জ্বালিয়ে দিলাম, দুটো লাশ ফেলে দিলাম, সে হাত গুটিয়ে ঘরে বসে রইল।

তাই তো, তাই তো !

জঙ্গম ইসারায় ভাস্কর পণ্ডিতকে আর বাড়তে নিষেধ করল। এদের বোকা বানাতে গিয়ে না সাপ বেরিয়ে পড়ে।

রাজা গোপাল সিংহের সঙ্গেও দেখা হল ভাস্কর পণ্ডিতের। দুই প্রধান সামনা সামনি বসলেন। একজন ভীষণ ধূর্ত প্রকৃতির। শরীরেও যথেষ্ট বল আছে। একজন ভাল মানুষ, অতি সজ্জন, ধর্মভীরু। যুদ্ধ বিগ্রহ একদম পছন্দ করেন না, শুধু আয়াসে দিন কাটাতে ভালবাসেন। গোপাল সিংহ বললেন, তোমরা এসে গেছ, ভালই হয়েছে। বর্গীদের সঙ্গে যুদ্ধ না করলে তাদের হটানো যাবে না। সবই মদনমোহনের ইচ্ছা। তাঁর সাধের বিষ্ণুপুরকে তিনিই রক্ষা করবেন। গোপাল সিংহ বড় রকমের এক দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন।

সেই দেখে ভাস্কর পণ্ডিত জঙ্গমের দিকে তাকালেন। ইসারায় বললেন, কেউ যখন নেই রাজার বুকে ছোরাটা ঢুকিয়ে দিই ? বলে তিনি কোমরে গোঁজা ছোরার বাঁটে হাত দিলেন।

জঙ্গম ইসারায় জানাল ও কাজটি করার চেষ্টা কর না পণ্ডিত, এখানে কেউ নেই বটে কিন্তু বাইরে পাহারাদার আছে। মেরে পালিয়ে যেতে পারবে না।

এদের ইসারায় কথাবার্তাতে গোপাল সিংহ নিজে খুবই দুর্বলতা

অনুভব করছিলেন। মনে মনে এও কি ভাবছিলেন না, ঠিকই তাঁর ভাবনা হচ্ছিল, দুই নতুন জোয়ান সৈনিক তাঁকে মারবার জন্যে কোন মতলব আঁটছে না তো!

এই সময়ে ভাস্কর পণ্ডিত কথা কয়ে উঠলেন, আপনি কিছু ভাববেন না রাজা, বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত যদি প্রাসাদ আক্রমণ করে আমি একাই তার মহড়া নিতে পারব।

গোপাল সিংহ তাকিয়ে তাকিয়ে জোয়ান ভাস্কর পণ্ডিতের চেহারা দেখে উৎসাহে বললেন, সে তুমি পারবে। তবু আমার কি মনে হয় জানো, ভাস্কর পণ্ডিত তো একা নয়, তার অজস্র মারকুটে সেনা আছে। সে জায়গায় আমাদের সেনা যুদ্ধবিগ্রহ না করে করে একেবারে অকর্মণ্য হয়ে গেছে।

এই সময়ে জঙ্গম বলল, না না আপনি যা ভাবছেন রাজা তা নয়, আমাদের বিষ্ণুপুর সেনা অনেক শিক্ষিত, আর ঐ যে বর্গী সেনার কথা বললেন না রাজা, সঙ্গমের কাছ থেকে শুনুন ওদের বাইরে থেকে খুব ভয়ঙ্কর মনে হয় বটে আসলে খুবই ভীতু প্রকৃতির। বলো না সঙ্গম রাজাকে কালকের কাহিনীটা।

ভাস্কর পণ্ডিত ইনিয়ে বিনিয়ে বিরাট দীর্ঘ করে তিনটি তাঁবু ও দুটি লাশের কাহিনী বলে গেলেন।

গোপাল সিংহ খুবই উৎসাহ বোধ করলেন। তারপর মন্দিরের দিকে জোড় হাত করে মদনমোহনের উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করতে করতে চোখের জলে ভাসতে লাগলেন।

রাজার কক্ষ থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে ভাস্কর পণ্ডিত বললেন, মল্লরাজ বীর হাম্বীরের বংশধর বলে মনেই হয় না। একে মারতে আমার ভৃত্য দুজনই যথেষ্ট। এতো শিশুর মতো সরল হলে কি রাজা হওয়া যায়?

জঙ্গম বলল, ঐ জন্যেই তো রাজ্যের এই হাল। না'হলে সেনাপতি পূণাম দীঘিতে বসে মাছ ধরে! না সেনারা সৈনিকের পোষাক ন্যাতা করে অস্ত্রে জং ধরায়!

সে যাই বলো জঙ্গম, এই রাজ্য আক্রমণ করতে আমার আর কোন উৎসাহ নেই। ভেবেছিলাম তেজী ও জেদী বিষ্ণুপুরকে আক্রমণ করে নিজের তেজের মোকাবিলা করব। সে জায়গায় মেয়েজাতের কতগুলি পুরুষকে মেরে কি লাভ ?

কিন্তু বিষ্ণুপুরের কোষাগারে অজস্র ধনরত্ন আছে। ভাল ভাল সোনা, হীরে, মুক্তোর ছড়াছড়ি। আমি সে কোষাগার দেখে এসেছি।

তাই নাকি ? ভাস্কর পণ্ডিতের চোখ হুটো চক চক করে উঠল। এতো ধনরত্ন !

জঙ্গম বলল, হবে না কেন বলো ? কম তো যুদ্ধবিগ্রহ করেনি বিষ্ণুপুর। এইতো ক'বছর আগে গোপাল সিংহর বাবা রঘুনাথ সিংহ বিদ্রোহী শোভাসিংহকে হারিয়ে কম ধনরত্ন আনে নি। খাজাঞ্চীখানার তহশীলদারই বলল, সে ধনরত্ন কত শকটে এসে যে পৌছেছিল গোনা যায় নি।

ভাস্কর পণ্ডিত শুনতে শুনতে লোভের চোখে বললেন, চল না জঙ্গম একবার কোষাগারটা দেখে যাই।

পণ্ডিত এতো লোভ প্রকাশ কর না। আমাদের ছদ্মবেশ জানতে পারলেই ওরাও আমাদের ছেড়ে দেবে না।

এই সময়ে কাকে যেন আসতে দেখে ওরা সরে পড়লেন।

মদনমোহনের সন্ধ্যা আরতি হচ্ছিল। ভীড়ের মধ্যে জঙ্গম ও ভাস্কর পণ্ডিত দাঁড়িয়েছিলেন। যথারীতি ওপাশে রাজা রাণী, পুরবাসী ভক্তরা দাঁড়িয়েছিল। গতদিনের কথা জঙ্গমের মনে আছে সেইজন্যে সে মদনমোহনের দিকে তাকাচ্ছিল না। কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিত একদৃষ্টে তাকিয়েছিলেন, তাঁর শোনা আছে জঙ্গমের কাছ থেকে মদনমোহনের কাণ্ড কিন্তু তিনি বিশ্বাস করেন নি, ওসব ঐশ্বরিক ক্ষমতা বুজরুকি ছাড়া আর কিছু নয়। গতদিনে জঙ্গম নিশ্চয় খুব ক্লান্ত ছিল, সেইজন্যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল।

রাজপুরোহিত পঞ্চপ্রদীপ হাতে নিয়ে নেচে নেচে আরতি করছিলেন। ঢোল, করতাল, শাঁখ, কাঁসর, ঘণ্টা দোরে দোরে বাজছিল। আলোর প্রভাবে ও বাজনার মেদুর স্পর্শে মদনমোহনের প্রস্তর মূর্তি মান বরূপে সজীব হয়ে উঠেছিল। মদনমোহন হাসছিলেন ঠোঁটে সুস্মিত হাসি নিয়ে।

ভাস্কর পণ্ডিত হঠাৎ অনুভব করলেন মদনমোহন তাঁর দিকে তাকিয়ে বক্র হাসি হাসছেন। বহু রাজা, মহারাজা, বড় যোদ্ধার এইরকম বক্র হাসি ভাস্কর পণ্ডিত দেখেছেন কিন্তু তাদের সেই হাসি তরবারীর এক ঘায়ে চিরতরে নিঃশেষ করে দিয়েছেন। স্পর্দ্ধা তিনি সহ্য করেন না। মদনমোহনের সেই ভ্রূকুটি দেখে তিনি কোমরের খাপে হাত দিলেন, সেই দেখে জঙ্গম নিঃশব্দে ভাস্কর পণ্ডিতের হাত চেপে ধরলে। চাপাস্বরে বলল, পণ্ডিত বিচলিত হওনা।

ভাস্কর পণ্ডিত ক্ষুব্ধকণ্ঠে জবাব দিলেন, বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের এতদূর স্পর্দ্ধা আমাকে তাচ্ছিল্য করে?

হঠাৎ ভাস্কর পণ্ডিত দেখলেন, মদনমোহনের ঠোঁট থেকে হাসি সরে গেছে। পরিবর্তে চোখের দুই দৃষ্টি দিয়ে আগুনের ফলা বেরচ্ছে। তীক্ষ্ণ সেই ফলা। ঠিক বর্শার মতো সূচাগ্র। আর কি আশ্চর্য এত লোক থাকতে তাঁর দিকে বার বার ছুটে আসছে। ভাস্কর পণ্ডিতের বিশাল বক্ষ, পরিধানে সৈনিকের পোষাক। কোমরের খাপে পোরা তরবারী কিন্তু সেই তীক্ষ্ণ আগুনের ফলা ভাস্কর পণ্ডিতের বিশাল বক্ষে এসে আঘাত সৃষ্টি করতে লাগল। তিনি হঠাৎ চিৎকার করে উঠলেন। তাঁর সেই চিৎকার জঙ্গম ছাড়া কারও কানে গেল না। জঙ্গম চাপাস্বরে ভাস্কর পণ্ডিতের হাতে চাপ দিয়ে বলল, বিচলিত হও না পণ্ডিত। ধরা পড়ে গেলে বিষ্ণুপুর আমাদের ছেড়ে দেবে না।

ভাস্কর পণ্ডিত বললেন, কি স্পর্দ্ধা এই পাথরের ঠাকুরের! চোখ থেকে আগুনের ফলা বের করে আমাকে আঘাত করছে। আমার সারা অঙ্গ জ্বলে যাচ্ছে। তখন জঙ্গমের শরীরেও একই অবস্থা হচ্ছিল, সে চাপাস্বরে বলল, চলো পণ্ডিত পালাই।

ভাস্কর পণ্ডিত বললেন, না আমি ঐ পাথরের চোখ দুটো উপড়ে নেব।

কি করে পণ্ডিত? জঙ্গম মৃদু হাসতে লাগল।

ভাস্কর পণ্ডিত ইতস্তত করে বললেন, যেমন করে হোক। আরতি হয়ে যাক্। লোকজন চলে যাক্। তারপর চুপিসাড়ে এই মন্দিরে দুজনে ঢুকব।

কিন্তু কথা তাদের বন্ধ হয়ে গেল। শরীরে অজস্র জলুনি শুরু হতে।

ভাস্কর পণ্ডিত বললেন, জঙ্গম আর যে এখানে থাকতে পারছি না।

আমিও। চলো পালিয়ে যাই।

যে ভাস্কর পণ্ডিত কখনও শত্রু ভয়ে ভীত ছিলেন না তিনি বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের ভয়ে মন্দির ছাড়লেন। ফাঁকা জায়গায় এসেও পরিত্রাণ পেলেন না। সেই আগুনের ফলা তখনও ছুটে আসছিল। অগত্যা ছুট লাগালেন। মাতালের মতো অচৈতন্য অবস্থায় এসে যখন তাঁবুতে ঢুকলেন, হঠাৎ নিজের খাসকক্ষে ঢুকতে গিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, জঙ্গম!

জঙ্গম পাশেই ছিল, বলল, কি হল পণ্ডিত?

ঐ দেখো!

জঙ্গম দেখল ভাস্কর পণ্ডিতের খাসকক্ষের মেঝেতে বিশাল এক গোখুরো সাপ ফণা তুলে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে আছে।

জঙ্গম বলল, এও কি বিষ্ণুপুরের ঠাকুরের কাণ্ড?

ভাস্কর বললেন, দেখাচ্ছি কাণ্ড। এই বলে বিরাট ক্ষুব্ধ ভঙ্গিতে তীক্ষ্ণধার তরবারী বের করে সেই ফণা লক্ষ্য করে ঘা মারলেন কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল, আর গোখরো ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটে এল ভাস্কর পণ্ডিতের দিকে! ভাস্কর পণ্ডিত বহু যুদ্ধে বহু পরাক্রমশালীকে হত করেছেন। এবারও ক্ষিপ্রভঙ্গিতে ঘুরে গিয়ে গোখুরোকে দ্বিতীয় আঘাত হানলেন। জঙ্গমও খাপ থেকে তরবারী বের করেছিল। ভাস্কর বললেন, তোমায় কিছু করতে হবে না জঙ্গম। যা করার আমিই করছি। আবার

আঘাত হানলেন গোখুরোর মাথা লক্ষ্য করে। গোখুরো মাথা নামিয়ে তাঁবুর ফাঁক দিয়ে বাইরে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

ভাস্কর পণ্ডিত বিজয়ীর মতো উল্লাসে হাঃ হাঃ করে হেসে উঠলেন। বললেন, দেখলে জঙ্গম। যদি তোমার বিষ্ণুপুরের ঠাকুরের এই কাণ্ড হয় তাহলে সে বুঝল কম শক্ত হাতে পড়েনি। আর যদি গোখুরো নিজেই কেরামতি মারতে এসে থাকে। তাহলে সেও বুঝল এখানে বিশেষ কিছু সুবিধে হবে না। কিন্তু জঙ্গম একটি কথাও বলল না। ক্লান্তিতে সেইখানেই হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল।

কিন্তু ওরা যে ছদ্মবেশ নিয়ে বিষ্ণুপুর প্রাসাদে ঢুকে ছিলেন, তা থেকে তাঁরা সরে এলেন না। বরং বিষ্ণুপুর সেনা বিভাগের একজন হয়ে আসন্ন যুদ্ধের জন্যে মেতে উঠলেন। বিশ্বাস সৃষ্টির জন্যে সেনাপতি দুর্জন সিংহের সঙ্গে এক হয়ে অস্ত্রাগারের মরচে ধরা সব অস্ত্র নতুন ঝকঝকে করে তুললেন। কামানগুলো অকেজো হয়ে পড়েছিল। বারুদখানায় বারুদ তৈরি করে কামানগুলি সক্রিয় করলেন। একদিন হঠাৎ অতর্কিতে গড়ের পরীখায় কামান গর্জে উঠতে রাজা গোপাল সিংহ আঁতকে উঠলেন, এই কে আছিস্ আমার পোষাক, অস্ত্র নিয়ে আয় বর্গীরা গড় আক্রমণ করেচে।

তাঁর চিৎকারে রাণী সুরঞ্জনা এসে বললেন, বর্গীরা গড় আক্রমণ করবে কেন? আমাদের দুই নতুন সেনা সঙ্গম, জঙ্গম কামান দেগেছে।

কেন ওরা কামান দাগল? সেনাপতি দুর্জন সিংহ কি করছিল?

তুমি না বড় অবুঝ ও ভীতু। এতো ভীতু হলে কি রাজ্য চালানো যায়! জঙ্গম সঙ্গম বারুদ দিয়ে কামানগুলো সক্রিয় করছিল। গোপাল সিংহ আশ্বত হয়ে উদ্বেগ মন থেকে সরিয়ে দিলেন!

কিন্তু গোলমাল বাঁধল ভাস্কর পণ্ডিতের গোয়াতু মিতে। জঙ্গল বহুভাবে নিষেধ করেছিল কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিত শোনেন নি। যে বারুদ তাঁরাই সৃষ্টি করলেন সে বারুদে জল ঢেলে বারুদ নষ্ট করে দিলেন ভাস্কর

পণ্ডিত। ব্যাপারটা গোপনে সম্পন্ন হলেও একেবারে চোখ এড়ানো গেল না। কিছু সেন ব্যাপারটা দেখে ফেলল এবং সেনাপতির কানেও সেটা গেল। বল্লভ বিষ্ণুপুর সেনা বিভাগের সবচেয়ে বলশালী সেনা। সে জঙ্গমের কাছে হারবার পর থেকে এদের ভাল চোখে দেখত না। সে বলল, নিশ্চয় এরা বর্গীর চর। বিষ্ণুপুর সেনাবিভাগে ঢুকে আমাদের সব নষ্ট করতে এসেছে।

সেনাপতি তাকেই ভার দিলেন এদের প্রতি লক্ষ্য রাখতে। বল্লভ হুকুম পেতে বহুদিনের আক্রোশটা মনে ঝালিয়ে নিল। দুই নতুন সেনা সারাদিন গড়ে থাকবার পর অন্যান্যদের মতো তারা বেরিয়ে যেত। কেউ জানতে চায় নি তারাও বলেনি। সেদিক ফটক পার হয়ে বেরিয়ে যেতে বল্লভ তাদের পিছু নিল। অন্ধকার পথ দিয়ে ওরাও চলেছে। ব্যবধান প্রথমে ছিল একশ হাত কিন্তু মাঝে মাঝে বল্লভ এদের খেই হারিয়ে ফেলছিল দেখে ব্যবধান কমাল, একশ হাত থেকে পঁচিশ হাত করে ফেলল।

ভাস্কর পণ্ডিত ও জঙ্গম কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। বিষয় সেই বারুদ। জঙ্গম বলল, বোধ হয় সেনাপতি দুর্জন সিংহ আমাদের চালাকি বুঝতে পেরেছে। আগের সেই জোরালো আহ্বান আর দেখলাম না, বরং কেমন যেন নিস্তেজ কণ্ঠ।

ভাস্কর পণ্ডিত তাচ্ছিল্য করে বললেন, ওসব দেখতে গেলে আমাদের চলবে না। সেনাপতি দুর্জন সিংহ একটা মানুষ নাকি? ও যদি আমার দলে থাকত চাবুক দিয়ে পিঠের ছাল তুলে নিতাম। রাজস্টেটের বড়পদ নিয়ে দায়িত্ব জ্ঞানহীনের মতো দীঘিতে মাছ ধরতে যায়।

জঙ্গম বলল, সেনাপতির দোষটা কোথায় বলো। অধিকাংশ সেনারই তো অবস্থা হয়েছিল, সৈন্যের চাকরী করে সব স্বাস্থ্য হারিয়ে অকর্মন্য এক একটা জন্তুতে পরিণত হয়েছে। তুমি বরং যথেষ্ট এদের উপকার করেছ, বিষ্ণুপুর আক্রমণ করতে না এলে এরা একেবারে শেষ হয়ে যেন।

ভাস্কর পণ্ডিত অন্যমনস্কর মতো পথ চলতে চলতে বললেন, তাতে আর আমার কি হল ? আগামী কাল শুক্লপক্ষ পড়ছে না, আর সময় নষ্ট নয়। কালই বিষ্ণুপুর আক্রমণ করব।

বল্লভ ওদের কথা শোনবার জন্যে অনেক কাছে চলে এসেছিল। জায়গাটি খুবই জঙ্গলাবৃত, আর ঘন অন্ধকার, সেইজন্যে বল্লভের কাছে আসার সুবিধা হয়েছিল।

ওদের তাঁবুও ওখান থেকে দূরে নয়। তাঁবুর কিছু খুচরো আলোও দেখা যাচ্ছিল। ভাস্কর পণ্ডিতের একটি চমৎকার ক্ষমতা ছিল, অনেকদূরে দুশমন থাকলেও দক্ষ শিকারীর মতো তা তিনি অনুমান করতে পারতেন। বল্লভের উপস্থিতিও তাঁর চোখ এড়ালো না। হঠাৎ অতর্কিতে খাপ থেকে তরোয়াল বের করে অনুমানে পাশে ঘা মারলেন।

বল্লভ এই আক্রমণ আশা করে নি। ধারালো তরোয়ালের আঘাতে তার কাঁধের মাংসপেশী ছিঁড়ে গেল। রক্তাক্ত হল কাঁধের জামা কিন্তু সে ভীরু নয় বা কমজোরী নয়, ঘুরে দাঁড়িয়ে সেও ভাস্কর পণ্ডিতকে আঘাত হানল। তুমুল যুদ্ধ লেগে গেল সেই জঙ্গলাবৃত অন্ধকার পথে। কিন্তু বল্লভ জানত না ভাস্কর পণ্ডিতের অজেয় শক্তির কথা। তিনি যে শত্রু নিধনে বন্য ব্যাঘ্র, যেমন মুখের পেশিতে লোভের ছায়া ফুটে ওঠে, তেমনি দেহের পেশিতে জাগে তীব্র শক্তি। তিনি ভীষণ বিক্রমে বল্লভকে আঘাত হানতে লাগলেন। বল্লভও মরীয়া হয়ে ভাস্কর পণ্ডিতকে আঘাত হানছিল। একবার বেকায়দায় পেয়ে হাঁটুতে আঘাত হানল। ভাস্কর পণ্ডিতের হাঁটু চিরে রক্ত ছুটল।

জঙ্গম বলল, আমি হাত লাগাব ?

ভাস্কর পণ্ডিত মুখ থেকে এক দলা থুথু বের করে ছিটিয়ে দিয়ে বললেন, মুষিককে মারতে দুজন দরকার হয় না জঙ্গম। আমি একাই একশো।

বল্লভ বলল, আমি মুষিক, তবে তুমি কি ছুঁচো ?

আরে আমি কে তুই যদি জানতিস্ তাহলে এতো তড়পাতিস্ না।

জঙ্গম বলে দাও তো আমি কে ?

এই সময়ে বল্লভ অতর্কিতে ভাস্কর পণ্ডিতকে আঘাত হানতে ভাস্কর পণ্ডিত রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বল্লভকে এলোপাথারি আঘাত হানতে হানতে চিৎকার করে উঠলেন, দেখ্‌ মুষিকের বাচ্চা আমি কে এবারে চিনতে পারছিস্ ? ভাস্কর পণ্ডিতের নাম শুনিস্ নি ? এই নামেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক বল্লভের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে গেল। সে পড়ে গেল মাটিতে। ভাস্কর পণ্ডিত আঘাতে আঘাতে তাকে শেষ করে দিলেন।

জঙ্গম চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, বলল, খতম হয়ে গেছে পণ্ডিত এবার ছেড়ে দাও।

ভাস্কর পণ্ডিত হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, আমার সঙ্গে লাগতে এসেছিল জঙ্গম।

জঙ্গম কৌতুকে বলল, ওরা ঠিক বুঝতে পারেনি পণ্ডিত। ওরা ভেবেছিল তুমি সঙ্গমই।

ভাস্কর পণ্ডিত সে কথার উত্তর না দিয়ে তাঁবু থেকে ছুটে আসা আলোয় বল্লভের নিষ্পন্ন দেহের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন। রক্তাক্ত বীভৎস একটি লাশ। লাথি দিয়ে দু একবার নেড়ে চেড়েও দেখলেন, তারপর মুখে এক ধরনের শব্দ করে তাঁবুর লোক ডাকতে লাগলেন।

জঙ্গম বলল, কি হবে লোক ডাকছ কেন ?

লোকটাকে বাঁধতে হবে।

বাঁধার দরকার কি ? মরে তো গেছে। লাশ নিয়ে করবে কি ? জঙ্গম কৌতুক করছে কিনা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে একবার পরখ করে নিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত বললেন, মনে হচ্ছে ব্যাটা মরে নি জিন্দা রয়েছে।

এদের এই কথোপকথনের মধ্যে বল্লভ চুপ করেই ছিল। হঠাৎ ওরা একটু অন্যমনস্ক হতে বল্লভ সেই রক্তাক্ত শরীরে দে ছুট। ভাস্কর পণ্ডিত তাঁর পিছন পিছন দৌড়ে গেলেন কিন্তু ধরতে পারলেন না। জঙ্গমকে দোষারূপ করে বললেন, তোমার জন্যেই ব্যাটা পালল।

তারপর বললেন, পালিয়ে আর কোথায় যাবে ? সব ব্যাটাকে কাল একসঙ্গে শেষ করে দেব।

বল্লভ অতর্কিতে সরে পড়লেও চলাতে তার কোন দ্রুততা ছিল না। বার বার অত্যধিক রক্তক্ষরণে কাহিল হয়ে পড়ছিল। বিশাল বক্ষ দ্রুত শ্বাস গ্রহণে ভীষণ আন্দোলিত হচ্ছিল। তার ওপর উপর্যুপরি আঘাতের বেদনা। প্রাণ বেরিয়ে বুঝি যায় যায় কিন্তু এখুনি প্রাণ বেরলে চলবে না। যে সংবাদ শুনেছে রাজাকে খবরটা না দেওয়া পর্যন্ত মরেও সে শান্তি পাবে না। বিষ্ণুপুরের রাজস্টেটের নিমক তো সে কম খায় নি। এই সঙ্গম যে খোদ বর্গী সেনাপতি ভাস্কর পণ্ডিত। এ খবর রাজার কানে দিতেই হবে। ওরা বর্গীদলের লোক, বারুদ নষ্ট করতে বোঝা গিয়েছিল কিন্তু সেই লোক যে আসল বর্গীসর্দার কে জানতো ?

ফটকওলা দূর থেকে রক্তাক্ত বল্লভকে দেখতে পেয়ে ছুটে এল। তারপর চিৎকার করে লোক জড়ো করতে লাগল। মূমূর্ষ বল্লভ তখন কথা বলার শক্তি হারাচ্ছিল। শুধু সে বলল, আমাকে রাজার কাছে নিয়ে চল।

যখন গিয়ে পৌঁছল, বহু গণমান্যও সেখানে এসে উপস্থিত হয়েছিল। রাজা গোপাল সিংহ এই বীভৎস চেহারা দেখে বেশ ভীত হয়ে পড়লেন। অহেতুক জোরে চিৎকার করে উঠলেন, কে কে কে এ কাজ করল ? তাকে ধরে নিয়ে এস। তাকে আমি চাবকে শেষ করে দেব। হাতীর তলায় ফেলে দেব।

বল্লভ আর দাঁড়াতে পারছিল না। যদিও সে দুজন লোকের দ্বারা অবলম্বন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। জড়ানো স্বরে বলল, হুজুর ঐ যে দুজন নতুন সেনা আমাদের দলে এসেছিল, তার মধ্যে একজন বর্গীসর্দার ভাস্কর পণ্ডিত।

গোপাল সিংহ ব্যাপারটা ঠিক অনুমান করতে পারলেন না। বললেন, কার কথা বলছ ?

প্রশ্নটা করলেন রানী সুরঞ্জনা বল্লভকে, তুমি কি ঐ সঙ্গমের কথা বলছ ?

হ্যাঁ রানী মা। ঐ সঙ্গমই ভাস্কর পণ্ডিত।

শোনার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সকলের মুখ পাংশুবর্ণ হয়ে গেল। সেনাপতি দুর্জন সিংহ বিবর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। রানীকে বল্লভ হাঁফাতে হাঁফাতে জড়ানো স্বরে সব ঘটনাটা বলে গেল, তারপর ধপাস করে রাজার সামনে চিৎপটান হয়ে পড়ে গেল। প্রাণ বায়ু তার বেরিয়ে গেল।

সেই দেখে রাজা গোপাল সিংহ আরও চিৎকার করে উঠলেন, কি সর্বনাশ বর্গীসর্দার গড়ের মধ্যে ঢুকতে পেল কেমন করে?

সকলে তাকাল সেনাপতি দুর্জন সিংহের দিকে। ঘটনাটা সকলেরই জানা। পূণাম দীঘিতে মাছ ধরতে গিয়েই দুই শত্রু নিয়ে ঢুকেছিলেন সেনাপতি দুর্জন সিংহ। সকলে তাকাতে দুর্জন সিংহ মাথা নত করলেন।

বাঁচিয়ে দিলেন রাণী সুরঞ্জনা। উপলক্ষ্য সেনাপতি কিন্তু বর্গীর সর্দারের সাহস কি? এত বড় গড়ের কেউই তার ছদ্মবেশ ধরতে পারল না।

রাজা গোপাল সিংহ বললেন, গড়ে ঢুকে আমাদের সব জেনে গেল। আর বাঁচার কোন রাস্তাই থাকল না। রাণী চলো আমি আর ভাবতে পাচ্ছি না। মদনমোহন যদি রক্ষা করেন তবেই রক্ষা নয়ত বিষ্ণুপুরকে আর কোনমতে বাঁচানো যাবে না। রাজা গোপাল সিংহ অসহায়ের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন। রাণী সুরঞ্জনা ধমকে উঠলেন, তুমি একটু থামো তো! বর্গীসর্দার যতো চালাকিই খেলুন, বিষ্ণুপুর না লড়ে কিছু সে হাতে তুলে দেবে না।

রাজা বললেন, লড়বে কেমন করে? বারুদে তো জল ঢেলে দিয়ে গেল।

রাণী শুধু ইসারায় মন্ত্রী, সেনাপতি, আরও কয়েকজন মাতবরকে ডেকে নিয়ে চলে গেলেন।

রাজা তখনও বল্লভের রক্তাক্ত মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে উন্মাদের মতো চিৎকার করছেন, হায় হায় শেষকালে বর্গীদের হাতেই প্রাণটা দিতে হবে। মদনমোহন কি এ যাত্রা আমাদের রক্ষা করবেন না।

পরদিন প্রত্যুষ থেকে রাজার কথাই ফলল। ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতে বিষ্ণুপুরের চতুর্দিক থেকে মানুষের চিৎকার ভেসে আসতে লাগল। সে পরিত্রাহি চিৎকারের বুঝি তুলনা নেই। গড়ের বাইরের গ্রাম, নগর যেন এক ঝড়ের মুখে পড়ল। গৃহবাসীর ঘর জ্বালিয়ে, সাজানো নগর তচনচ করে বর্গীসৈন্যরা তাণ্ডব নৃত্য করতে লাগল। তাদের প্রধান উদ্দেশ্য লুণ্ঠন, সোনা, দানা, হীরে মুক্তো টাকা পয়সা না দিলে অত্যাচার। তরোয়ালের এক এক কোপে মুণ্ডগুলো সব পথে গড়াতে লাগল।

গ্রামবাসীরা, নগরবাসীরা বাঁচাও বাঁচাও রবে পরিত্রাহি, চিৎকার করতে লাগল। তাদের আর্ত চীৎকারের মরণভেদী আর্তনাদ গড়ে এসেও আছড়ে পড়ল।

রাজা গোপাল সিংহ সারারাত্রি চোখের পাতা এক করতে পারেন নি। দুগ্ধফেননিভ সুকোমল শয্যায় শুয়ে তিনি কণ্টক শয্যা মনে করেছেন। ভয়ে হিমশীতল হয়ে গেছে তাঁর হাত পা। আর চোখের সামনে রক্তাক্ত খণ্ডিত বল্লভের বীভৎস মৃতদেহ দেখেছেন। এই বীভৎসতাই তাঁর চোখের পীড়াদায়ক। তিনি যে একেবারে রণকৌশল জানেন না তা নয়। রাজা রঘুনাথ সিংহের ছেলে হয়ে তাঁকে সব বিদ্যায়ই পারদর্শী হতে হয়েছিল কিন্তু যুদ্ধবিগ্রহ বড় জঘন্য প্রকৃতির। যুদ্ধ করে পরদ্রব্য লুণ্ঠন করা যায় বটে কিন্তু শান্তি মেলে না। আর রক্ত সব সময়ে উত্তপ্ত হয়ে থাকে। রক্ত যেন চায় আরও রক্তের আস্বাদ। সেইজন্যে মল্লভূমিতে বিষ্ণুপুরে তাঁর আমলে যুদ্ধকে একেবারে নাকচ করে দিয়েছিলেন। কয়েক হাজার সেনাবাহিনী থাক্ গড়ে। সেটা রাজার ঠাট হিসাবে। তারা মাসে মাসে মাসোহারা নিক কিন্তু যুদ্ধ আর নয়। আর তিনিও যুদ্ধ বাদ দিয়ে আরামে প্রজাপালন করে দিন অতিবাহিত করছিলেন।

যুদ্ধ বাদ দিয়ে যেমন সৈন্যরা অলস হয়ে গিয়েছিল, তেমনি তিনি নিজেও যুদ্ধের নামে এক ভয়াবহ আতঙ্ক মনে পোষণ করতেন।

রাজা এমনি ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছেন জানেন না।

ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্ন দেখলেন, মদন মোহন মন্দির থেকে উঠে এসে রাজার সামনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর ঠোঁটে সেই স্মিত হাসির চ্ছটা, তিনি হাত তুলে রাজাকে অভয় দিলেন, মৃদুস্বরে বললেন, তোমার কোন ভয় নেই রাজা আমিই বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করব। শুধু গ্রাম, নগর থেকে সকলকে এসে গড়ের মধ্যে স্থান দাও।

রাজার ঘুম ভেঙে যেতে তিনি খুবই সান্ত্বনা বোধ করলেন। ভোরের স্বপ্ন কখনও বিফলে যায় না। মদনমোহন নিজে স্বপ্নে দেখা দিয়ে অভয় জানিয়ে গেছেন কিন্তু স্বস্তি বোধ ও তাঁর মনে বেশিক্ষণ স্থায়ি হল না। গড়ের বাইরে থেকে প্রচণ্ড জোরে অজস্র মানুষের মর্মভেদী চিৎকার কানে আসতে লাগল। তিনি চিৎকার করে উঠলেন, এই কে আছিস্? এতো কোলাহল কেন গড়ের বাইরে?

রানী সুরঞ্জনা ছায়ার মতো নিংশব্দে এসে গম্ভীর স্বরে জানালেন, বর্গীরা বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেছে।

বর্গীরা বিষ্ণুপুর আক্রমণ করেছে?

হ্যাঁ।

আমরা তাহলে কি করব?

আমি সৈন্যদের তৈরি হতে হুকুম দিয়েছি। তুমিও যুদ্ধসাজে সেজে নাও।

কি বলছ তুমি?

ঠিকই বলছি। ওদের ভয়ে কি মল্লরাজ্য কাপুরুষের মতো শত্রুর হাতে দলিত হবে?

তুমি কি ভাস্কর পণ্ডিতকে দেখ নি? তার সঙ্গে যুদ্ধ করে কি আমরা পারব?

পারি না পারি মোকাবিলা তো করব। তারপর জয় সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।

এই সময়ে আবার ছুটে এল একদল মৃত্যুভীত কণ্ঠস্বরের তীব্র আর্তনাদ। রানী সুরঞ্জনা ছটফট করে বললেন, কি এখনও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছ? পোষাক পরে নাও।

এই সময়ে হাজার হাজার বিষ্ণুপুরের সেনা সৈন্যসাজে সজ্জিত হয়ে প্রাসাদ প্রাঙ্গণের সামনে এসে দাঁড়াল।

রাজা গোপাল সিংহ সেই দিকে তাকিয়ে এতটুকু মনে বল পেলেন না। রানী সুরঞ্জনার দিকে তাকিয়ে বললেন, বর্গীসৈন্যের কাছে তোমার এ সেনা এক ফুঁয়ে উড়ে যাবে। তার চেয়ে আমার মাথায় একটা মতলব এসেছে।

কিন্তু রানী সুরঞ্জনা স্বামীর এই ভীরুতায় এতটুকু সন্তুষ্ট হলেন না। তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, তোমার মতলব তো যুদ্ধ না করা। ধিক্ তোমার রাজা উপাধীতে। আর ধিক তোমার মনুষ্যজীবনে। বীর হাম্বীরের বংশধর হয়ে যে কিভাবে তুমি কাপুরুষ সেটাই আমি বিস্ময়ে ভাবি।

রাজা রানীর তিরস্কার হজম করে নিলেন। শান্তস্বরে বললেন, আমাকে যতই তীরস্কার কর, মন দিয়ে আমার কথাটা শোন। আমি বিষ্ণুপুরকে বাঁচাতে চাই, ধ্বংস করতে চাই না।

বেশ বলো।

এই কিছুক্ষণ আগে মদনমোহন স্বপ্ন দিয়েছেন, সমস্ত নগরবাসী, গ্রামবাসীদের এনে এই গড়ের মধ্যে স্থান দাও।

তারপর।

তারপর মদনমোহন নিজে রক্ষা করবেন।

রাণী সুরঞ্জনা রাজার মুখে শিশুর মতো কথা শুনে হেসে উঠলেন, তুমি কি বালখিল্যর মতো কথা বলছ না?

রাজা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, কখনই না। আমি বার বার বলছি, বর্গীদের সামনে তোমার এই অপটু সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যেও না। তার চেয়ে নগরবাসীদের ঘোষণা দিয়ে গড়ের মধ্যে নিয়ে এস। তারপর গড়ের সদর ফটক বন্ধ করে দাও। সৈন্যদের মোতায়েম কর গড়ের মাথায়। বর্গীরা সদর ফটক ভাঙবার চেষ্টা করলেই আমরা ওপর থেকে তাদের ঘায়েল করব।

তারপর।

তারপর মদনমোহনের আরাধনার জন্যে অষ্টপ্রহর সংকীর্তন কর,

ষোড়শোপচারে তাঁর পূজা হোক, যাঁর বিষ্ণুপুর তিনি রক্ষা করবেন। কখন সেনাপতি দুর্জন সিংহ এসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, কেউ লক্ষ্য করেননি। রাজা গোপাল সিংহ থামলে বললেন, ঠিক কথাই রাজা বলেছেন রাণীমা। আমাদের এই সামান্য সৈন্য নিয়ে বর্গীদের দুর্ধর্ষ সৈন্যর কাছে কিছুই পারব না। তার চেয়ে নগরবাসীদের গড়ের মধ্যে ডেকে নিয়ে এসে গড় বন্ধ করে দিই। গড়ের ওপর থেকে বর্গীদের আক্রমণ করি, ওরা সহজে তো এই গড়ে ঢুকতে পারবে না।

বলতে বলতে অজস্র গ্রামবাসী, নগরবাসী, ছেলে, বুড়ো, নারী-পুরুষ যে যা পেরেছে সঙ্গে নিয়ে পিল পিল করে গড়ে ঢুকতে লাগল। প্রাণের ভয় বড় ভয়, আগে প্রাণ বাঁচানো, তারপর সংসারের হাঁড়িকুড়ি। সেই প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে রাজার হুকুম ছাড়াই বাসিন্দারা গড়ে এসে ঢুকেছিল। রাজা বললেন, দুর্জন সিংহ আর অপেক্ষা কর না। শাস্ত্রী পাহারাদারকে জানিয়ে দাও, প্রাসাদ শীর্ষ থেকে ভেরিনিনাদ করে নগরবাসীদের জানিয়ে দিক যে যেখানে যে অবস্থায় আছে শীঘ্র গড়ে এসে প্রবেশ করুক, না হলে গড়ের সদর ফটক বন্ধ হয়ে যাবে।

কিছুক্ষণ পরে ভেরিনিনাদে শাস্ত্রী পাহারাদার প্রাসাদ শীর্ষ থেকে সে কথা নগরবাসীর কানে পৌঁছে দিল। যাদের গড়ে ঢুকতে একটু ইতস্তত: ভাব ছিল, তারা আর ইতস্তত: করল না। বরং এই দেখা গেল, বহু আহত মানুষ প্রাণ বাঁচানোর জন্যে গড়ে এসে আছড়ে পড়ল। তাদের শুশ্রূষার ব্যবস্থা করলেন রাণী সুরঞ্জনা।

কোন পরিবারের কর্তাব্যক্তি বর্গীর দ্বারা আক্রান্ত হয়ে অত্যন্ত নৃশংসভাবে নিহত হয়েছে তারা বিলাপ করতে করতে গড়ে ঢুকল। গড়ে বসবাস করার জায়গা অপ্রতুল নয়, বলতে গেলে একটা ছোটখাট নগরই গড়কে কেন্দ্র করে আছে, তবু উন্মুক্ত মাঠ ময়দান তো কম ছিল না। নিম্নশ্রেণীর চাষাভূঁষো শ্রেণীর লোকেরা মাঠের মাঝেই জায়গা করে নিল। মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীদের জন্যে বিরাট বিরাট অতিথিশালার বড় বড় ঘরগুলি খুলে দেওয়া হল। তাছাড়া আছে মন্দির সংলগ্ন অনেক ঘর, সে মদনমোহনের খাস এক্তিয়ারে, সেখানেও নগর-

বাসীদের জায়গা হল।

ইতিমধ্যে মদনমোহনের পুজোর বিরাট আয়োজন হয়েছিল। রাজার হুকুমে যোড়শোপচারে সারাদিন ধরে মদনমোহনের আরাধনা হবে। বিষ্ণুপুরের যিনি শ্রেষ্ঠ রাজা, যিনি চিরকাল বিষ্ণুপুরকে দু'হাতে আগলে রেখেছেন তাঁকে সন্তুষ্ট করতে হবে। এই চিন্তা করে রাজপুরোহিত নিত্য পূজার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

তাছাড়া সংকীর্তন শুরু হয়ে গিয়েছিল। খোল করতাল সহযোগে নাম সংকীর্তনে গড় মুখর হয়ে উঠেছিল। সে শব্দ বাইরে যেতেও দেরি হয় নি। বাইরে রণতাণ্ডব, নৃশংস হত্যা, সীমাহীন অত্যাচার, নারী, শিশু, যুবা কেউই অত্যাচার থেকে রেহাই পাচ্ছিল না। বর্গীদের অশ্বক্ষুরের ধ্বনিতে প্রান্তরের পর প্রান্তর মুখর, ইতিমধ্যে গড় থেকে এই সংকীর্তনের ধ্বনি বর্গীদের কানে যেতেও তারা স্তব্ধ হয়ে গেল।

ভাস্কর পণ্ডিত একজন বিষ্ণুপুরের ব্যবসাদারের বুকের ওপর পা চাপিয়ে তার বেয়াদপি শেষ করছিলেন ইতিমধ্যে এই সংকীর্তন ধ্বনি কানে যেতে জঙ্গমের দিকে তাকিয়ে বললেন, কি ব্যাপার জঙ্গম, বিষ্ণুপুর কি যুদ্ধ না করে সংকীর্তন করবে?

জঙ্গম হেসে বলল, তাই তো দেখছি।

না না তুমি হেসো না জঙ্গম। ওদের মতলবটা একবার জেনে নিতে হবে।

জঙ্গম হাসতে হাসতেই বলল, মতলব ওদের যুদ্ধ করবে না। সংকীর্তন করতে করতে বিষ্ণুপুর ত্যাগ করে চলে যাবে। আমরা নির্বিবাদে গড়ে ঢুকে সব লুঠ করে ফিরে যাব।

ভাস্কর পণ্ডিত না হেসে সহজকণ্ঠে বললেন, সেরকম কিছু যদি হয় তাহলে মন্দ হয় না। কিন্তু এমন সহজ পন্থা কি বিষ্ণুপুর নেবে? ক্ষমতা না থাক্ অহঙ্কার তো কম নেই তাছাড়া ওদের পাথরের ঠাকুরের তেজও কম নয়।

জঙ্গম বলল, তুমি সেই পাথরের ঠাকুরের কথা কিছুতে ভুলতে পাচ্ছ না দেখছি।

ভুলব মানে ? ভাস্কর পণ্ডিতকে জব্দ করেছে এমন কাউকে কি এ পর্যন্ত তুমি দেখেছ ? বিষ্ণুপুরের ঐ পাথরের ঠাকুরকে এই জন্যে কিছুতে ভুলতে পারি না। চোখ দিয়ে তীর ছুঁড়ে কি ভাবে আমাদের সারা শরীর জ্বালিয়ে দিল।

এই সময়ে স্থূলকায় ব্যবসাদারটা ভাস্কব পণ্ডিতের পা ছাড়িয়ে পালাবার চেষ্টা করছিল হঠাৎ ভাস্কর পণ্ডিত কোমর থেকে তীক্ষ্ণধার ছোরাটা বের করে খুব সহজ ভঙ্গিতে ব্যবসাদারের স্থূল উদরের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিলেন।

ব্যবসাদার মনোহর দাস একবার আহ শব্দ করে মাটিতে চোখ উলটিয়ে পড়ল। রক্তাক্ত ছোরাটা একবার ঘাসের বুকে ঘষে নিয়ে ভাস্কর পণ্ডিত বললেন, চলো জঙ্গম আমরা গড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ি, আমাদের সেনারাও তো গড়ের দিকে চলেছে। জঙ্গম ও ভাস্কর পণ্ডিত দুজনে ঘোড়ার উপর উঠে বসে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন।

রাজার নির্দেশেই গড়ের উঁচু খিলানের ওপর সারি সারি সেনা সাজানো হয়েছিল। গড়ের উঁচু খিলান এমনভাবে তৈরি, যা বাইরে থেকে একেবারে দেখা যায় না সেখানে সৈন্য মোতায়েন হলে। তীক্ষ্ণধার বিষ মাখানো বর্শা নিয়ে সৈন্যরা বর্গীদের সঙ্গে মোকাবিলা করবার জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। সেনাপতি দুর্জনসিংহ একটি লুকায়িত স্থান থেকে তাদের পরিচালনা করবার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। গড় প্রাসাদের ফটক বন্ধ হয়ে যাবার হুকুমনামা ঘোষণা হয়েছিল। সেইজন্যে নগরবাসীরা পড়ি মরি করে গড়ের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছিল। সে এক ভয়ঙ্কর বিশ্রী প্রতিযোগিতা, প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা, নিরাপদ আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে প্রবেশ করার আকুল বাসনা।

গড় প্রাসাদের সদর ফটক বন্ধ হবার ঘোষণা প্রচারিত হবার পর রাজা গোপাল সিংহ পোষাক ছেড়ে মন্দিরে যাবার জন্যে পট্ট বস্ত্র পরিধান করতে উদ্যত হলেন। রানী সুরঞ্জনা বললেন, ওকি তুমি যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হবে না ?

রাজা গোপাল সিংহ রানীর কথার কোন উত্তর না দিয়ে পোষাক

পরিবর্তন করলেন।

সেই দেখে রানী ক্ষুব্ধকণ্ঠে বললেন, এই পোষাক পরে কোথায় যাচ্ছ ?

এই পোষাক পরে কোথায় যাই জানো না ? রাজা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন।

দেশের রাজা হয়ে তুমি সৈন্যদের শত্রুমুখে ঠেলে দিয়ে মন্দিরে গিয়ে ঠাকুর আরাধনা করবে ?

রাজা শুধু তীব্র দৃষ্টিতে রাণীর দিকে তাকালেন কিন্তু কোন উত্তর দিলেন না।

এখনও আমি বলছি দেখো তুমি মন্দিরে যেও না। যুদ্ধসাজে সেজে সৈন্যদের সামনে গিয়ে দাঁড়াও। ভুলে যেও না বিষ্ণুপুরের কোন রাজা এমনি কাপুরুষতার পরিচয় দিয়েছে ?

তবু রাজা এগিয়ে চললেন দেখে রাণী আর থাকতে পারলেন না। বললেন, তুমি যদি এমনি ব্যবহার কর, তাহলে আমি সেনাদের কাছে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

রাজা এবার রাণীর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি আমাকে কি মনে কর !

কি মনে করব ?

খুব দুর্বল, অকর্মণ্য, ভীরু, আয়াসী রাজা এই তো !

স্পষ্ট কথায় রাণী চুপ করে রইলেন।

আমি যুদ্ধ সাজে সজ্জিত হলেই তোমার গর্বে বুক ফুলে উঠবে এইতো ! যুদ্ধজয় না হোক কোন ক্ষতি নেই। বিষ্ণুপুর ধ্বংস হোক তাতেও কোন ক্ষতি নেই।

না তা কেন ?

তা যদি না হয়, তাহলে আমার কাজের সমালোচনা কর না। আমি তো দেশের রাজা। আমার তো সবচেয়ে বড় দায়িত্ব। আমার ওপর বিশ্বাস রেখে দেখো আমি কোন পথে এগিয়ে চলি।

রাণী সুরঞ্জনা মাথা নেড়ে বললেন, তুমি তো যুদ্ধ ছেড়ে মন্দিরে

যাচ্ছ মদনমোহনকে ডাকতে। এতো কাপুরুষরাই ডাকে। যাদের কেউ নেই তাদের আছে ঈশ্বর।

ভুল রাণী ভুল। যাদের সব আছে তাদেরই উচিত ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করা। যিনি সর্বশক্তিমান, তিনিই রক্ষা করেন সব।

কিন্তু ঈশ্বর এও বলেন, মানুষকে দিয়েছি ক্ষমতা, সে ক্ষমতা মানুষ সদ্ব্যবহার না করে যদি আমার ওপর নির্ভর করে, তাকে আমি দেখি না।

ওটা তুমি নিজে বানিয়ে নিয়ে বলছ সুরঞ্জনা। আমার ওপর রাগ করে।

এই সময়ে গড়ের সদর ফটক শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। রাজা ছটফট করে উঠে বললেন, আর বিলম্ব করার সময় নেই রাণী, তুমি যদি মনে কর তাহলে মন্দিরে আসতে পার—এই বলে তিনি দ্রুতপদে মন্দিরের দিকে চলে গেলেন।

সেখানে তখন ভীষণ রবে খোল করতাল সহযোগে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে সংকীর্তন হচ্ছিল। যত ভয়, ততই তো ভক্তি। বর্গীর রুদ্ররোষ, নৃশংস অত্যাচার, বিষ্ণুপুর আজ ধ্বংস হতে চলেছে। সেই ধ্বংসের হাত থেকে বিষ্ণুপুর যাতে রক্ষা পায় তার জন্যেই কেঁদে কেঁদে সংকীর্তন করে চলেছে ভক্ত নরনারীবৃন্দ। অজেয় শক্তিধর নির্বাক পাথরের ঠাকুর মদনমোহন কি সেই দেখে হাসছেন ? হাসছেনই বোধ হয়। কারণ মানুষের এই হানাহানির মাঝে তিনি চিরকালই শান্ত। বিষ্ণুপুরকে তিনি চিরকালই এইভাবে রক্ষা করে এসেছেন। এবারও কি না করবেন ? সে কথা অন্য কেউ না জানলেও দেশের রাজা ঠিকই জানেন। সেইজন্যে যুদ্ধসাজে না সেজে পটবস্ত্র ধারণ করে মন্দিরে এসেছে। রাজাকে দেখে অগণিত ভক্ত নরনারীবৃন্দ বিপুল উদ্যমে সংকীর্তনে মেতে উঠল।

গড়ের ফটক যখন শব্দ করে বন্ধ হছিল, তখন অনেকেই পড়িমরি করে গড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ছিল। আমাদের পূর্বপরিচিত সেনা সর্বোদয় সৈন্যসাজে সেজে সঙ্গে সরলাকে নিয়ে গড়ে ঢুকছিল। সরলা

সঙ্গে অনেক জিনিসপত্তর এনেছে। কিছু ফেলে আসতে তার মন টনটন করছিল। তাই তুটো বাক্স স্বামীর মাথায় চাপিয়ে দিয়েছে। বিছানাটাও না নিয়ে এসে পারে নি। কোথায় শুতে দেবে, আদৌ শুতে দেবে কিনা ঠিক কিছু নেই। অন্ততঃ মাঠের ওপর বিছানা পেতেও তো শোয়া যাবে, এই সব ভেবে বিছানাও ছাড়ে নি। সর্বোদয় যতো বলেছে, আরে আমার তো রাজস্টেটে একটা অধিকার আছে। তুমি ভাবছ কেন ? তোমার ভালমত জায়গা হয়ে যাবে।

কিন্তু সরলা ধমকে বলেছে, তুমি থামো তো। কোথায় কি পাব তা কি আর আমি জানি না। তোমার কথা শুনে সব ফেলে যাই, তারপর কাঁদতে বসি। সেই সব চিন্তা করে সরলা এতই লটর বহর নিয়ে এসেছে যে অন্যান্যরা দেখে তাজব।

ফটকওলা মানু সিং সরলাকে দেখে আর হেসে বাঁচে না। পাশে সর্বোদয়কে দেখে তাই সে বলে উঠল, অ তুমার ঘরবালী আছে না সেনা। তা ঘরটাও এর সাথে তুলে নিয়ে এলে না কেন ?

কথাটা বলেছ ভাল। বলতে বলতে সর্বোদয় হাসতে যেতেই তুটি দরজা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। বর্গী সৈন্যরা অশ্বারূঢ় হয়ে ফটকের বিরাট গড়ের দরজার কাছে নগরবাসীর ওপর অত্যাচার করতে করতে এসেছিল। কিন্তু গড়ে ঢোকবার হুকুম পাই নি বলে দরজার বাইরে থমকে গিয়েছিল।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতে মনে হল অন্য পৃথিবীতে চলে গেল বিরাট এক সংখ্যক লোক। এ পাশে অত্যাচারী বর্গীরা হতবুদ্ধির মতো দাঁড়িয়ে রইল কিন্তু সেখানে নিরাপদে দাঁড়ানোও গেল না। ওপর থেকে ঝাঁক ঝাঁক বিষাক্ত তীর, আর বর্শা এসে নীচে পড়তে লাগল।

গড়ের বাইরে অন্য কোন ভয় ছিল না, এ পাশটা একেবারেই বর্গীদের এক্তিয়ারে এসে গিয়েছিল। শুধু ফটক দরজার বরাবর জল-প্লাবিত পরীখা বাদ দিয়ে উঁচু এক খিলানে বিরাট এক কামান একান্ত অবহেলায় পড়েছিল। গড়ের দরজা বন্ধ না হলে এটা দিয়ে হয়ত শত্রু তাড়ানো যেত। হয়ত কেন এই কামানের বহু গুণপনার ইতিহাস

আছে। এর নাম দলমাদল, বীর হাম্বীবের সময় থেকে গড়কে রক্ষা করে আসছে এই কামান কিন্তু আজ উপহাসের মতো অবহেলায় পড়ে আছে নিঃশব্দে।

বর্গীর সৈন্যরা গড়ের উপরের বিষ্ণুপুর সৈন্যের আঘাত থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে এসে কামানটি একমনে পরীক্ষা করতে লাগল।

লোহা জমানো বিরাট বেড়ের জবরদস্ত কামান। বারুদ এনে পূরে দিলে সে যে সব ছারখার করে দেবে এ নিশ্চিত। এই কামানের গায়ে কিছু সি দূরের প্রলেপ দেখে বর্গী সৈন্যরা হেসে উঠল।

এরা কামানেরও পূজা করে!

বর্গীরা জানে না কিন্তু বিষ্ণুপুর জানে, এই কামান বহুবার এই গড় রক্ষা করেছে। রক্ষা করেছে বিষ্ণুপুরের অহঙ্কারী ঐতিহ্যকে। কামানের ওপর সিঁদুরের প্রলেপ, গড়ের মধ্যে যুদ্ধের পরিবর্তে সংকীর্তনের ঢোল করতালের ধ্বনিতে বর্গী সৈন্যরা কেমন যেন হতবুদ্ধি হয়ে গেল।

মাঝে মাঝে অতর্কিতে দু একজন সেনা যে বিষ্ণুপুরের সৈন্যদের হাতে নিহত হচ্ছিল না তা নয় কিন্তু বর্গীদের করার কিছু ছিল না।

বিশ হাত চওড়া জলপ্লাবিত পরিখার ওপারে ঢালু পিচ্ছিল গড়ের শক্ত দেওয়াল। দেয়ালের দৈর্ঘ্যও সাততলা সমান উঁচু। পিচ্ছিল দেয়ালের বুকে বর্শা ফলকের মতো কাঁচ বিছানো। কেউ দেয়াল বেয়ে কোনরকমে ওঠবার চেষ্টা করলে তার দেহ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে। তার ওপর ছাতের প্রাচীর ধরনের দু মানুষ সমান প্রাচীর। প্রাচীরের গায়ে বড় বড় ফুটো দিয়ে সৈন্যরা বর্গীদের দিকে তীর নিক্ষেপ করছিল।

বর্গী সৈন্যরা এসব পরীক্ষা করে হতাশ হল। গড়ের মধ্যে ঢোকার কোন উপায় নেই। গড়ের ফটক যে ভাঙবে তারও কোন উপায় নেই। লোহার মোটা চাদরের শক্ত মজবুত বিরাট দরজা। হাজার বছর চেষ্টা করলেও সে দরজা ভাঙা যাবে না। তার ওপর দরজার দুটি পাল্লা খাদে পাতা ছিল। দরজা উঠে যেতে বিস্তৃত খাদ জলপ্লাবিত। কজন বর্গী সৈন্য উঁকি মেরে দেখল, খাদে বড় বড় কুমীর কিলকিল করছে।

এই সময়ে ভাস্কর পণ্ডিত সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। বহু যুদ্ধজয়ে বিজয়ী বীর ভাস্কর পণ্ডিতের কপালেও চিন্তার রেখা ফুটে উঠল। তিনি পাশে তাঁর সহকারী জঙ্গমের দিকে তাকিয়ে বললেন, জঙ্গম খুব একটা ভুল হয়ে গেল। বিষ্ণুপুর বাসিন্দাদের ওপর অত্যাচার না করে অতর্কিতে গড় আক্রমণ করলেই ভাল হত। তাহলে এরা আর সুযোগ পেত না গড়ের দরজা বন্ধ করে দিতে।

জঙ্গম মুচকে হেসে বলল, ভাস্কর পণ্ডিতের কেন ভুল হল বলবো ?

ভাস্কর পণ্ডিত সহকারীর দিকে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে রইলেন।

জঙ্গম সেই দেখে বলল, অমন সর্দারের ভঙ্গিতে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থেকো না। তাহলে বলব না।

ভাস্কর সহজ ভঙ্গিতে সহজ করেই বললেন, ঠিক আছে বলো।

তুমি গড় আক্রমণ করলে না ঐ পাথরের ঠাকুরের ভয়ে।

ঝুট্। ভাস্কর পণ্ডিত গর্জন করে উঠলেন।

অপ্রিয় সত্য কথা স্পষ্ট করে বললে কানে লাগে পণ্ডিত।

ভাস্কর সে কথার জবাব না দিয়ে প্রধানের কণ্ঠস্বরে সেনাদের হুকুম দিলেন, কামানগুলো টেনে এনে গড়ের সামনে লাগাও। তারপর একযোগে গড়ের ওপর কামান দেগে যাও।

জঙ্গমও সেনাদের যে কথা মনে এল তা এই, পাথরের গড়ের দেয়াল কামান দেগে কিছুই করা যাবে না। শুধু শুধু বারুদগুলো নষ্ট হবে কিন্তু প্রধানের মুখের অবস্থা দেখে কেউই সাহস করল না সে কথা বলতে! কেউ না বলতে পারুক জঙ্গম পারত কিন্তু জঙ্গম শুধু মুচকি হেসে পণ্ডিতের যুদ্ধ পরিচালনা দেখতে লাগল।

বর্গী সেনাপতির কথা অনুযায়ী কামানগুলি টেনে এনে গড়ের সামনে লাগানো হল। তারপর তাতে বারুদ সংযোগ করে তোপ দাগা হল। প্রচণ্ড শব্দ করে তুমুল যুদ্ধ লেগে গেল। গড়ের মাথারও চারিদিকের চার কোণে কামান মোতায়েন ছিল, সেগুলি চুপ করে থাকল না। গোলা এসে পড়তে লাগল বর্গী সৈন্যের ওপর। বহু হতাহত হতে লাগল। কিন্তু ভাস্কর পণ্ডিত কম সৈন্য নিয়ে বঙ্গদেশে

লুণ্ঠন কার্য চালাতে আসেন নি। কিছু হত হলে তাতে কিছু তার যায় আসে না। কিন্তু তিনি বিস্মিত হয়ে একটা কথা ভাবছিলেন সমস্ত বারুদে তো তিনি জল ঢেলে দিয়ে এসেছেন, তাহলে এরা বারুদ পেল কোথায় ? সে কথা বিস্ময়ে জঙ্গমকে জিজ্ঞাসা করলেন।

জঙ্গম হেসে বলল, তুমি তো নতুন তৈরি বারুদে জল ঢেলে দিয়ে এসেছ, পুরোনো যা মজুত ছিল তাতে তো জল ঢেলে আসোনি ?

ভাস্কর পণ্ডিত মাথা নেড়ে সে কথা স্বীকার করলেন। সত্যি সে কথা তিনি একবারও ভাবেন নি।

এদিকে বিষ্ণুপুর গড়ও স্থির মস্তিষ্কে ছিল না। মন্দিরে যেমন তুমুল ঢোল করতাল নিনাদে মদনমোহনের পূজা ও সংকীর্ত্তন হচ্ছিল, তেমনি গড়ের পরিখার ওপর দাঁড়িয়ে সৈন্যরা বর্গীদের ওপর আক্রমণের মোকাবিলা করছিল। তবে সবারই মনের মধ্যে আতঙ্ক জমে উঠছিল, পাথরের গড় গোলার আঘাতে আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে। এক সময়ে কি ভেঙে পড়বে না ? তখন……। এ কথা জাগছিল সেনাদের মধ্যে। বাসিন্দা বলতে যারা মদনমোহন মন্দিরে যায় নি তাদের মধ্যে কিন্তু মদনমোহনের কাছে যারা গেছে তাদের মধ্যে এ আতঙ্ক দানা বাঁধে নি। যত যুদ্ধের প্রচণ্ডতা ভেসে আসছিল তত তারা মদনমোহনের মধ্যে বিভোর হয়ে উঠছিল। আর বলছিল, ঠাকুর তুমিই সব। আজ বিষ্ণুপুর ঘোর বিপদে পড়েছে। তুমি বরাবর এই বিষ্ণুপুরকে রক্ষা করেছ আজও কর। মানুষ কি তোমার শক্তির চেয়ে বড় ? এ কথা কেউ মুখ দিয়ে বলছিল না। কিন্তু সবার মনের কথা এই। সকলে সংকীর্তনে মত্ত ছিল। নেচে নেচে হরিনামে মত্ত হয়েছিল ভক্তবৃন্দ।

রাজা গোপাল সিংহও ভক্তদের মতো নৃত্য করছিলেন। তাঁর দুগাল বেয়ে শুধু অশ্রু ঝরে চলেছে। তাঁর উর্ধাঙ্গে কিছু ছিল না। শুধু কোমরে পট্টবস্ত্র।

এই সময়ে রাণী সুরঞ্জনা এসে সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজাকে দেখে তিনি খুশি হলেন না, বললেন, বর্গীদের কামানের গোলায় গড় ভেঙে পড়বার উপক্রম, আর তুমি এখানে নাচ করছ ? তুমি না

বিষ্ণুপুরের রাজা !

রাণী সুরঞ্জনার তীব্র শ্লেষ মিশ্রিত কথায় রাজা গোপাল সিংহ এতটুকু বিচলিত হলেন না। যে রাজা আগে ছিলেন শত্রু ভয়ে ভীত, যুদ্ধ আতঙ্কে দুর্বল হয়ে পড়তেন। সেই রাজার শরীরে কে যেন বলের সঞ্চার করেছিল, তিনি বাজনার তালে তালে নাচতে নাচতে বললেন, সুরঞ্জনা ওসব চিন্তা ভুলে এস না আমার সঙ্গে নৃত্য কর। যাঁর ভাবনা তিনি ভাববেন, আমরা ভাবি তাঁকে, তিনি রক্ষা করবেন আমাদের।

ওসব ভাবাবেগের কথায় তোমার মন ভরে, আমার ভরে না। তুমি তোমার রাজার কর্তব্য করবে না !

রাজার কি কর্তব্য ?

কেন রাজার কি কর্তব্য জানো না ?

না।

দ্বারে শত্রু। তোমার কি এখন যুদ্ধ সাজে সেজে যুদ্ধে যাওয়া উচিত নয় ?

না।

তোমার কি তবে কর্তব্য ঠাকুর তলায় কতকগুলি অকর্মণ্য লোকের সঙ্গে মিশে নৃত্য করা ?

তুমি যা বলো।

রাণী ক্ষিপ্ত হয়ে রেগে চলে গেলেন। তাতে একটু সময় মন্দির প্রাঙ্গণে ব্যাঘাত সৃষ্টি হল বটে তারপর আবার আগের অবস্থা ফিরে এল। ওদিকে রণদামামা, এদিকে পূজা-পাঠ, সংকীর্তন। রাজ-পুরোহিত ষোড়শোপচারে পূজা করতে করতে কখনও মন্ত্রপাঠ করছেন, কখনও আরতি করছেন। পাথরের ঠাকুর যেন এতটুকু বিচলিত নন, তার হাসি যেন তীব্র বেগে আরও স্ফুরিত হতে লাগল। তিনি যেন করুণাপ্রার্থী ভক্তদের দিকে তাকিয়ে নিরুত্তরে বলতে লাগলেন, আমিই শ্রেষ্ঠ, আমিই সব। তোমাদের রক্ষাকর্তা আমি, তোমাদের ধ্বংসও আমার দ্বারা হয়। এই বিপদে তোমাদের আমি রক্ষা করব, ভয় কি ?

কিন্তু ভক্তরা ঠাকুরের এই নিরুত্তরের কথা অন্তর দিয়ে উপলব্ধি

করতে পারলেন না। তাঁরা কেঁদে কেঁদে শুধু বিপদে মধুসূদনকে ডেকে চললেন।

দু দলে তুমুল লড়াই হচ্ছিল। কিছু বর্গী সৈন্য সেনাপতির হুকুমে পশ্চিমের কোণ থেকে গড়ের দেয়াল বেয়ে দড়ি দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করছিল। নিচে ক্ষুধিত নরখাদক কুমীরের দল খাদের জলে কিলবিল করছিল। ওখানে পড়লে যে কুমীরের খাদ্যের সুব্যবস্থা হবে বর্গী সৈন্যরা বুঝতে পেরেছিল কিন্তু করার কিছু নেই, সেনাপতির হুকুম। সেই হুকুম তামিল করছিল কিছু সৈনিক, দড়ি ধরে গড়ের ওপরে উঠছিল কিন্তু আর উঠতে পারল না। দেখে ফেলল ওপরের সৈন্যরা। বিষাক্ত তীর খেয়ে তারা সেই কুমীর ভর্তি জলপূর্ণ খাদে গিয়ে পড়ল। এতদিন কুমীররা উপবাসে ম্রিয়মান ছিল, অতর্কিতে বিপুল খাদ্যসম্ভার প্রাপ্ত হয়ে দারুণ ভোজে মত্ত হয়ে উঠল।

এদিকে অকৃতকার্য হলেও ভাস্কর পণ্ডিতের সুপরিকল্পিত কৌশলে গড়ের মজবুত পাথরের দেয়াল উপর্যুপরি কামানের গোলার আঘাতে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। সে দেয়াল যে এক সময়ে স্থানচ্যুত হবে সে দু পক্ষই বুঝতে পারছিল। সেইজন্যে ভাস্কর পণ্ডিত বার বার উৎসাহে হুকুম দিচ্ছিলেন, থামবে না কামান দেগে যাও।

সারি সারি কামানগুলি এক বেগে তোপ দেগে গড়ের ভিত কাঁপিয়ে তুলছিল। আর বুঝি গড় রক্ষা হয় না। গড়ের বাসিন্দাদের ছোট্ট বুকে প্রচণ্ড ত্রাস। এই সময়ে হঠাৎ বর্গী সৈন্যরা চমকে উঠল। ভাস্কর পণ্ডিতও চমকে উঠলেন। গড়ের বাইরে থেকে হঠাৎ ঝাঁক ঝাঁক গোলা গিয়ে বর্গী সৈন্যদের মাঝে গিয়ে পড়তে লাগল। অগুণতি বর্গী সৈন্য আহত নিহত হতে লাগল। কিছু প্রাণ ভয়ে পলায়নোদ্যত হল। ভাস্কর পণ্ডিতও বিস্মিত হলেন। একি তাঁর সৈন্যরা বিদ্রোহী হল নাকি? না'হলে গোলা আসে কোত্থেকে?

অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল গড়ের ফটকের সামনে যে একান্ত

নির্জীব দলমাদল কামানটি ছিল সে এখন রণমুখর হয়ে উঠেছে। সে দাগছে পরের পর তোপ কিন্তু তার লৌহ জঠরে কে গোলা ভরে দিচ্ছে? কোন মানুষের তো দেখা পাওয়া যাচ্ছে না।

জঙ্গম বলল, নিশ্চয় ঐ পাথরের ঠাকুর।

কিন্তু তখন আর ভাবার সময় ছিল না, হঠাৎ ভাস্কর পণ্ডিত অনুভব করলেন, কে যেন তার জামা ফুঁড়ে কিছু প্রবেশ করাচ্ছে। ভয়ঙ্কর জ্বালা। তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে বললেন, জঙ্গম এ মনে হচ্ছে সেই পাথরের ঠাকুর যুদ্ধে নেমেছে। চোখ থেকে সেই আগুনের তীর ছুঁড়ে মারছে। জ্বালা অনুভব করছ না!

জঙ্গম বলল, করছি।

কিন্তু আমরা তাকে বুঝিয়ে দেব আমাদের সঙ্গে পারা মুস্কিল। এই বলে ভাস্কর পণ্ডিত তরবারী অসিমুক্ত করে ওপর দিকে তুললেন। কে যেন তার হাত চেপে ধরল। অসি মুষ্টিহীন হয়ে মাটিতে পড়ে গেল।

তখন দলমাদল মুহুর্মুহু কামান দেগে চলেছে। বর্গী সৈন্য আর এগোতে না পেরে প্রাণ বাঁচানোর জন্যে পিছু হটে পালাচ্ছে। জঙ্গম, ভাস্কর পণ্ডিতও নিরুপায় হয়ে ছুটতে লাগলেন। ওপর থেকে বিষ্ণুপুর সৈন্যরা সবই দেখতে পাচ্ছিল। তারাও বিস্মিত হচ্ছিল দলমাদলের কাণ্ড দেখে। খবরটা রাজার কাজেও চলে গেছে কিন্তু রাজা তখন সংকীর্তনে বিভোর। এই অলৌকিক কথা শুনে আরও তিনি মদন-মোহনের আরাধনায় মত্ত।

গড়ের সব লোকই জেনেছে বর্গীরা পলায়িত। রাণী সুরঞ্জনাও শুনেছেন। তিনি এতক্ষণ মৃত্যুভয়ে ভীত হয়ে নিজের শয়ন কক্ষে শুয়ে কাঁদছিলেন। হঠাৎ দলমাদলের কাণ্ড শুনে তিনি তাঁর অপরাধের মাত্রাটা বুঝতে পারলেন। ছুটে গিয়ে মন্দিরে আছড়ে পড়লেন, ঠাকুর আমাকে তুমি ক্ষমা কর। আমি তোমার মহিমা বুঝতে পারিনি।

গড়ের সদর ফটক খোলা হল। দলমাদলের কাছে গিয়ে বিষ্ণুপুরের মানুষ ভেঙে পড়ল। দলমাদল তখন রণক্লান্ত। শুধু মুখ দিয়ে তখনও

বারুদের ধোঁয়া বের হয়ে চলেছে।

কিন্তু রাজা গোপাল সিংহ একবারও দলমাদলের কাছে গেলেন না। তিনি তখনও মদনমোহনের দিকে তাকিয়ে অশ্রু ব্যাকুল। রাণী সুরঞ্জনা কাছে এসে চোখের জলে ভেসে বললেন, রাজা তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি তোমার উদ্দেশ্য বুঝতে পারি নি। তোমাকে অকর্মণ্য, দুর্বল, বুদ্ধিহীন কত কিছু নীচ কথা বলেছি।

রাজা কোন কথাই বললেন না, শুধু ইসারায় মদনমোহনকে দেখিয়ে বললেন, বিষ্ণুপুরের ঐ রাজার কাছে ক্ষমা চাও। অপরাধ যদি কিছু করে থাকো সব ওঁর কাছে করেছ। আমার কাছে নয়। তিনিই আজ বিষ্ণুপুরকে বর্গীদের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। চিরকাল এই ভাবেই রক্ষা করে যান বিষ্ণুপুরকে। আজও তার এতটুকু ব্যতিক্রম হয় নি।

রানী সুরঞ্জনা সেই যে মদনমোহনের সামনে মাথা হেঁট করলেন, অনেকক্ষণ সে মাথা নামিয়েই রাখলেন।

—:—

হুগলীর দাসবাজার

আজ আর দাস প্রথা নেই। কাউকে কিনে নিয়ে তাকে যেমন-তেমন ভাবে খাটানোর দিন চলে গেছে, মুঘল বাদশাহের আমলে তার প্রচলন ছিল। বোধ হয় সেই মুঘল শাসনের কালে এদেশে দাস প্রথার চল ছিল বলে বিদেশীরা এসেও সেই দাস প্রথা অব্যাহত রেখেছিল। এখানে যখনকার কথা বলা হচ্ছে, সে সময়ে হুগলী বন্দরের ধারে পর্তুগীজরা স্বাধীন উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। সে উপনিবেশ গড়ার হুকুম তারা সম্রাট আকবরের কাছ থেকে পায়। সেই আকবরের কাল থেকে তারা হুগলীতে নিজেদের পরিবার নিয়ে বাস করে আসছিল। কিন্তু তাদের ব্যবসা করার হুকুম ছিল। ব্যবসা ছাড়া যে ভেতরে ভেতরে এদেশ গ্রাস করার ফন্দি ছিল সে অনেকেই বুঝতে পারেনি। কিন্তু তাদের চিন্তা ইংরেজদের মতো ছিল না। ইংরেজদের ছিল কৌশল, তারা চাইল শক্তি দিয়ে দেশ কবজা করতে। সেইজন্যে তারা ভূমিকা নিল বোম্বেটের। হার্মাদ দস্যুরা ভূমিকা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাংলার বিভিন্ন গ্রামের ওপর। এক একটি গ্রামকে তচনচ করে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সেই সব গ্রামের মানুষদের নিয়ে আসতে লাগল জাহাজ ভর্তি করে। কি নৃশংস তাদের পরিকল্পনা। শিশু, বৃদ্ধ, ও জোয়ান, নারী পুরুষদের হাত ফুটো করে তার মধ্যে শিকল ভরে এই দাসবাজারে এনে বিক্রি করতে লাগল। জোয়ান মানুষের দাম এক, অকমর্ণ্যদের দাম এক। যার যে শক্তি সে সেই দামে বিকোয়। এমনি একটি ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে ধরে এনেছিল হার্মাদ দস্যু পেড্রো। পেড্রোর মতো নৃশংস প্রকৃতির পিশাচ দস্যু আর একটিও ছিল না। তার একটা চোখ নেই। কে যেন খুবলে নিয়েছে। জনরব ছিল একবার সুন্দরবনের এক গ্রাম রেড করতে গিয়ে বাঘের খপ্পরে পড়েছিল, সেই ব্যাঘ্রদেবতা পেড্রোর ভয়াল চোখের তীব্রদৃষ্টি কেয়ার করে নি নখাঘাতে তা উপরে নিয়েছিল।

সে যাই হোক, সেই পেড্রো ধরে এনেছিল বালীদ্বীপ থেকে এক পুরোহিত ব্রাহ্মণকে। পেড্রো যখন তার দলবল নিয়ে গ্রাম চড়োয়া হয় সেই সময়ে গোষ্ঠবিহারী শিবমন্দিরে পূজো সারছিল। গ্রামের সবচেয়ে পুরনো শিবমন্দির, জাগ্রত শিব সম্বন্ধেও বহু কিম্বদন্তী আছে। গোষ্ঠবিহারীর ধারণা ছিল হার্মাদ দস্যু গ্রাম লুঠ করলেও এই মন্দিরে ঢুকতে পারবে না কারণ মন্দিরের মধ্যে শিবের পাশে ত্রিশূল গাঁথা আছে, হার্মাদ দস্যু ঢুকলে শিব নিজেই উঠে ত্রিশূল সংহার করবেন। এ বিশ্বাস শুধু পুরোহিত গোষ্ঠবিহারীর নয়, গ্রামের সবার। অবলতি-কেশ্বরের মহিমা বড় কম নয়। আজও কেউ মানত করলে সে সঙ্গে সঙ্গে ফল পায়। পুরোহিত গোষ্ঠবিহারী পূজা করতে করতে জানতে পেরেছিল, গ্রাম হার্মাদরা লুঠ করছে। নারী পুরুষ শিশুদের কান্না, আর্তনাদ ভেসে আসছে কিন্তু গোষ্ঠবিহারী পূজায় নিজেকে মগ্ন রাখে। এবং মনে মনে প্রার্থনাও জানায়, অবলতিকেশ্বর তোমার শক্তি দেখাও। গোষ্ঠবিহারী নিজেও খুব দুর্বল মনের লোক নয়, তারও শারীরিক শক্তি অটুট, দরকার হলে দস্যুদের সঙ্গে লড়বার ক্ষমতা তারও আছে। সেই ক্ষমতাই তাকে শেষপর্যন্ত প্রয়োগ করতে হল।

পেড্রো নিজেই সেই মন্দিরে ঢুকে পড়েছিল, তরোয়ালের আঘাতে পূজার নৈবেদ্য তচনচ করে হুঙ্কার তুলে বলেছিল, ব্রামিন বশ্যতা স্বীকার কর, না'হলে মুণ্ড ধর থেকে নামিয়ে দেব।

কিন্তু গোষ্ঠবিহারী এতটুকু নম্র না হয়ে অবলতিকেশ্বরের সেই ত্রিশূল তুলে পেড্রোকে আক্রমণ করেছিল কিন্তু পেড্রো এসব বেয়াদপকে শায়েস্তা করার কৌশল জানে, অতর্কিতে হাতের ওপর আঘাত হেনে ত্রিশূল স্থানচ্যুত করেছিল। গোষ্ঠবিহারীর একখানি হাতের কবজি দু ভাগ হয়ে গিয়েছিল, রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছিল। কুৎসিৎ দর্শন পেড্রো হলুদ দাঁত বের করে হেসে বলেছিল, ব্রাম্নি পূজা তোমার পেশা, অস্ত্র ধরতে এলে কেন? বশ্যতা স্বীকার কর, তুমার সুরত আচ্ছা আছে, দাস বাজারে চড়া দামে বিকোবে। কিন্তু গোষ্ঠবিহারী আবার অন্যহাতে মাটি থেকে ত্রিশূল তুলতে গেল, এবার পেড্রো তরবারীর আঘাত

হানল দেহ বরাবর। এক পাশের কাঁধ থেকে চওড়া বুকটা ফালা হয়ে গেল। পেড্রো পৈশাচিক আনন্দে হেসে উঠল, কেমন ব্রামিন ভাল লাগছে। গৌরদেহে খুনের পৈতা বানিয়ে দিলাম।

গোষ্ঠবিহারী আরও যুঝবার চেষ্টা করছিল কিন্তু রক্তস্রাবে শরীর অবসন্ন হয়ে যেতে বাধা হয়ে ধরা দিল। তার শুধু কান্না পাচ্ছিল, এতদিন সে কায়মনবাক্যে অবলতিকেশ্বরকে ডেকেছে কিন্তু তিনি এই বিপদে রক্ষা করলেন না। একরকম মনে অভিমান নিয়েই ব্রাহ্মণ পুরোহিত গোষ্ঠবিহারী ধরা দিল।

এক জাহাজ নারী পুরুষ শিশুর সাথে গোষ্ঠবিহারী হুগলীর দাস-বাজারে এক প্রত্যুষে এসে হাজির হল। সে সময়ে হুগলীর দাস-বাজারের রমরমা অবস্থা। দাসবাজারের সমস্ত কর্তৃত্ব পর্তুগীজদের। আজ যেখানে ব্যাণ্ডেল গীর্জা, সেখান থেকে দূরে যে ভাগীরথী সামান্য নদীর মতো দেখা যায়, সেদিন ছিল চওড়া সমুদ্রের মতো বিশাল। যার কোল ছুঁয়ে দক্ষিণ বাংলা, সন্দীপ, বাকলা, সুন্দরবন, বালেশ্বর, বেতোড়, আরও এগিয়ে গেলে চট্টগ্রাম, আরাকান, দক্ষিণে গোয়া পর্যন্ত যাওয়া হেত। এ সব জায়গার নাম করা হল এইজন্যেই যে পর্তুগীজদের অধিকারে এই সব জায়গা ছিল। তাদের জাহাজও এই সব অঞ্চল দিয়ে ঘুরে মানুষ ধরে এনে ফলাও ব্যবসা করত। হুগলী উপনিবেশে শুধু দাসবাজার ছিল না, ছিল পর্তুগীজ কলোনী, ধর্মান্তরিত খৃষ্টান ও অস্থায়ী দুর্গ। পর্তুগীজরা যে ভেতরে ভেতরে এ দেশ গ্রাস করার ফিকিরে ছিল তার প্রমাণ ঐ দুর্গ। তারা যেমন জাহাজে করে মানুষ আনত, আনত বহু অস্ত্রশস্ত্র, গোলবারুদ, কামান, বন্দুক। একদিন যে তারা যুদ্ধ করে এ দেশ কব্জা করবে ভেতরে ভেতরে তার প্রস্তুতি ছিল।

দাসবাজারে মানুষ বিক্রী হত এই রকমভাবে, শিশুরা একদিকে, যুবকরা একদিকে, বৃদ্ধ বৃদ্ধরা ছিল অপাংক্তেয় দলের। তাদের জাহাজে তোলার সময়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হত, যদি না মরত দাসবাজারে এনে একদিকে ফেলে রাখা হত। যদি দয়া করে কেউ কিনত তার

কাছ থেকে খুবই কম দাম নেওয়া হত। আর যে কিনত সে জানত এই বৃদ্ধবৃদ্ধাদের দিয়ে সংসারে কি কাজ করানো হবে। ধান ভাঙা, চাল ভেজানো, গরুর জাবনা দেওয়া অর্থাৎ সংসারের ছুট্ কাজের জন্যে এদের কেনা হত। সবচেয়ে দামে বিক্রী হত জোয়ান নারী-পুরুষ। নীলামদার তাদের বিক্রীর সময়ে হাওয়ায় চাবুক ভাসিয়ে উল্লাসে চিৎকার করত, কই হ্যায় তাজা জোয়ান লেনে বালা।

ভীড়ও সেই দিকে এগিয়ে আসত। পুরোহিত গোষ্ঠবিহারীকেও সেই জোয়ান পুরুষের সারিতে দাঁড় করানো হয়েছিল। সত্যিই তাকে সুন্দর দেখতে। এত লোকের মধ্যে সে দাঁড়িয়েছিল্ তার সারা শরীর চুঁইয়ে তখনও রক্ত গড়াচ্ছে। হাত ফুটো করে শিকল পরিয়ে দিয়েছে. সবই সত্য কিন্তু তবু পুরোহিত সুন্দর অন্যদের চাইতে। হার্মাদ দস্যু পেড্রো একটু দূরে দাঁড়িয়ে নীলামদারকে ইশারা করল, নীলামদার সঙ্গে সঙ্গে চাবুক তুলে হাওয়ায় কবার সাঁই সাঁই শব্দ করে চিৎকার জাগিয়ে তুলল, কই হ্যায় জোয়ান ব্রামিন লিবেন তো চলে আসুন। পূজা করবেক, রসুই বি করবেক। বালো রসুই। কালিয়া, কুপ্তা, মছলির ঝুল বলে নীলামদার আপন রসিকতায় হো হো করে হেসে উঠল।

খদ্দের অধিকাংশ বাঙালী, অন্যদেশীয় নেই যে তা নয়, ব্রাহ্মণ পূজা করতে জানে আবার রান্না করতে জানে শুনে কেউ কেউ বিস্ময়ে গোষ্ঠবিহারীর কাছে এগিয়ে এল, কি হে কি পুজো তুমি করতে পার? মন্ত্র জানো? কেউ বলল, কি রান্না করতে পার? আমার ভীষণ পেটের রোগ, মাগুর মাছের ঝোল রাঁধতে পারবে?

কিন্তু যাকে জিজ্ঞসা করা হল সে কোন কথা বলল না। সে শুধু মনে মনে অবলতিকেশ্বরকে ডাকতে লাগল, হে ত্রিকালজ্ঞ হে মহাকাল তোমায় এতকাল ডেকেছি তবে কিসের জন্যে? তুমি কি আমার এই দুরাবস্থা খণ্ডন করবে না? গোষ্ঠবিহারীর চোখ ফেটে জল গড়াতে লাগল। এখানে এই দাসবাজারে আর এক দল ঘুরত তারা পাদরী। তারা পর্তুগাল থেকে আর এক হুকুম নিয়ে এসেছিল, যারা

খৃষ্টান হয়ে পর্তুগীজদের দল ভারী করবে তাদের কিনে নেবে এ সব পাদ্রী। ঢোলা পোষাকে পাদ্রী মাইকেল এগিয়ে এল গোষ্ঠবিহারীর দিকে। অ বাবু টুমি খৃষ্টান হোবে তাহলে মুক্তি পাবে। আমরা জমি দিবে, টাকা দিবে, ঘর বানাবে, বহু হবে।

হার্মাদ পেড্রো মাইকেলের কথায় হেসে উঠল, হ্যাঁ, তুমার কুথা ও শুনবে ফাদার। ও সাচমুচ ব্রামিন আছে। কিন্তু ওরা কেউ জানে না গোষ্ঠবিহারী তখন কি মতলব আঁটছিল। সে শুধু নিজের হাতের শিকলের দিকে তাকিয়েছিল। হঠাৎ পাদ্রী মাইকেলের দিকে তাকিয়ে বলল, সাহেব আমাকে তুমি খৃষ্টান করবে? মাইকেল কিছু বলার আগে যারা গোষ্ঠবিহারীকে পছন্দ করেছিল তারা হৈ চৈ করে উঠল, না না ফাদার আমরা ওকে কিনব? পেড্রো হো হো করে হেসে উঠল। মজাটা মন্দ জমে নি। সে আনন্দের চোটে কোমর থেকে পিস্তল বের করে উঁচু করে দুবার গুলি ছুঁড়ে দিল।

ফাদার মাইকেল শুধু নম্রস্বরে বলল, কেউ যদি খৃষ্টান হতে চায়, কারুর বাধা দেবার অধিকার নেই, বলে সে বুকের ক্রশে হাত দিয়ে মেরিকে অভিবাদন জানাল।

গোষ্ঠবিহারী দেখল মতলবটা সে মন্দ করে নি। মরণ তো তার হবেই। ধর্ম হারিয়ে বাঁচার চেয়ে ধর্ম নিয়ে মরা অনেক ভাল। মনে মনে সে আওড়াল ঃ ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং কাশ্যপেয়ং মহাদ্যুতিম। ধ্বান্তারিং সর্ব্বপাপঘ্নং প্রণতোহস্মি দিবাকরম্॥

ফাদার মাইকেল এগিয়ে এসে নীলামদারের হাতে টাকা গুঁজে দিল। গোষ্ঠবিহারীর হাতে বাঁধনও খুলে দেওয়া হল। শুধু যে সব খদ্দেররা একে কিনতে পারল না তারা গজরাতে লাগল। —যত সব ফাদারদের কাণ্ড। কেমন সুন্দর জোয়ান একটি ব্রাহ্মণকে পাওয়া যাচ্ছিল। কেউ বলল, আমার মন্দিরের পুরোহিতই নয় করে নিতাম। সেই গর্জনের মধ্যে থেকেই ফাদার মাইকেল গোষ্ঠবিহারীকে নিয়ে বেরিয়ে এল।

গোষ্ঠবিহারী একটা বুদ্ধিমানের কাজ করেছিল, ফাদারের সঙ্গে আসাতে তার বেশ বিশ্রামও হয়েছিল। ফাদার মাইকেল তাকে

নিয়ে গেল গীর্জা ঘরে। বলল হাঁটু মুড়ে মেরিকে অভিবাদন কর। সত্ত কেনা মনিবের অবাধ্য হল না গোষ্ঠবিহারী। হাঁটু মুড়ে চোখ বন্ধ করল কিন্তু ডাকল সেই বালীদ্বীপের অবলতিকেশ্বরকে।

তারপর স্নান, খাওয়া সেরে নতুন পোষাক পরে সেই গীর্জা ঘরে ঘুমোল। ফাদার মাইকেল তাকে বলে দিয়ে গিয়েছিল, তুমি স্বাধীন, যেখানে খুশি ঘুরতে পার তবে পোর্ট পিকুনো ছেড়ে কোথাও যেও না। পর্তুগীজরা সপ্তগ্রামকে পোর্ট গ্রাণ্ডি বলত ও হুগলীকে পোর্ট পিকুনো।

গোষ্ঠবিহারীর কোথাও যাবার বাসনা ছিল না। তার মনে মনে এক অটল সঙ্কল্প। মৃত্যু তো হবেই, এভাবে বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না। নিজের স্বাধীন চিন্তা নিয়ে যদি না বাঁচা যায় তবে বেঁচে থেকে কি লাভ? দিন শেষ হয়ে সন্ধ্যা নেমে এল। গোষ্টবিহারী ধড়মড় করে উঠে বসল। দাসবাজার থেকে সে দেখেছিল পাশেই দুর্গ। মাটির দুর্গ। দুর্গের মাথায় পর্তুগালের নিশান। সেখানে শাস্ত্রী পাহারাদার পাহারা দিচ্ছে।

জীবনে সে একটা কীর্তি রেখে যাবে। অন্তত এ দেশের মানুষ বিদ্রোহী হতে গেলে তার কথা ভাববে। সে গীর্জা বাড়ী ছেড়ে সেই দুর্গের সামনে এসে দাঁড়াল। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এসেছে বলে তাকে কেউ লক্ষ্য করল না। সে সুড়ুৎ করে দুর্গের মধ্যে ঢুকে গেল। দুর্গটি ভালই। পর্তুগীজরা যে খুব আরামে আছে সে দেখলে বোঝা যায়। একটা বিরাট হলঘরে খুব গান, নাচ ও খানাপিনা হচ্ছিল। সেই হলঘরে দস্যু পেড্রোকেও দেখা গেল। দস্যু পেড্রোকে দেখে তাড়াতাড়ি গোষ্ঠবিহারী অন্ধকারে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। যদি এখুনি ধরা পড়ে যায় তাহলে তার সঙ্কল্প বানচাল হয়ে যাবে। শোনা আছে এখানে প্রচুর গোলাবারুদ গুদামজাত করা আছে। যদি একবার সেই গোলাবারুদে আগুন ধরাতে পারে তাহলে হুগলী উপনিবেশ ছারখার হয়ে যাবে। পর্তুগীজদের অনেকদিনের লুকোনো স্বপ্ন হাওয়ায় ভেসে যাবে। পর্তুগীজদের আর এদেশ গ্রাস করার

ইচ্ছা কাজে লাগবে না। গোষ্ঠবিহারী তো মরবে কিন্তু সে তার স্বদেশ বাসীর বহু উপকার করে যাবে। গোষ্ঠবিহারী ইতস্তত চোখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগল গুদোমটা কোথায়? দুর্গটা বেশ লম্বা মনে হয়, দশ বারো বিঘার কমে হবে না। সারি সারি অনেক ঘর। সেই সব ঘরে সৈন্যরা বিশ্রাম নিচ্ছে। একটু এগিয়ে যেতে পশ্চিম কোণের দিকে গোষ্ঠবিহারীর চোখ গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে সে উল্লসিত হয়ে উঠল। হুঁ এটাই যে গুদোম এ বিষয়ে কোন ভুল নেই। সামনে একজন মাত্র শান্ত্রীপাহারাদার পাহারা দিচ্ছে কিন্তু তারও লক্ষ্য ঐ গানবাজনার দিকে! লোকটাকে অন্যমনস্ক দেখে গোষ্ঠবিহারীর সুবিধে হল সে অতর্কিতে লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। বেশি কষ্ট করতে হল না। ওরই পিস্তলের বাঁট দিয়ে ওর মাথার আঘাত করতে সে লুটিয়ে পড়ল। তাড়াতাড়ি দেহটা গুদোমের মধ্যে নিয়ে গোষ্ঠবিহারী পোষাক পালটে ফেলল।

সে নিশ্চিন্ত হল এই ভেবে তাকে ধরার উপায় আর নেই। সেও এখন পর্তুগীজ পাহারাদার বনে গেল। কিন্তু বেশি দেরি করলে হবে না, তাহলে সঙ্কল্প বানচাল হবে। এই ভেবে সে পাহারাদারের পকেট সার্চ করল, সিগারেট আর দেশলাই পেয়ে গেল। সিগারেট রেখে সে দেশলাই নিয়ে গুদোমের মধ্যে ঢুকে গেল। থাক্ থাক্ গোলাবারুদে জায়গাটা পূর্ণ। এক মিনিট ভাবল গোষ্ঠবিহারী, একটা দেশলাইয়ের কাঠি ছোঁয়ালেই দুম দুম করে ফাটতে শুরু করবে গোলাবারুদগুলো। সে কি অক্ষত দেহে পালাতে পারবে? কিন্তু পালানোর চিন্তা কেন আসছে গোষ্ঠবিহারীর সে বুঝতে পারল না। তবে কি তার বাঁচার ইচ্ছা জাগছে? হাসি পেল গোষ্ঠবিহারীর। নিজেকে বলল, গোষ্ঠ তুমি বেঁচে কি করবে? বাঁচে কেন মানুষ? আবার বালীদ্বীপে ফিরব। আরাধ্য দেবতা অবলতিকেশ্বরকে পূজা করব।

গোষ্ঠবিহারী আর অপেক্ষা না করে দেশলাই হাতে সেই বারুদঘরে ঢুকে গেল। 'শুধু মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হল, কোথায় অন্ধকার চলে গেল। দুম দুম ফট ফট আলো, ধোঁয়া আর বিকট শব্দ। সেই শব্দতে গান,

নাচ থেমে গেল। মুহূর্তের মধ্যে দূর্গের চেহারা অন্যরকম হয়ে গেল। তখন প্রাণ বাঁচানোর তাড়া। দূর্গপ্রধান কাপ্টেন ডি মিলো ফটক বন্ধ করতে হুকুম দিয়েছিল কিন্তু কে হুকম তামিল করবে ?

এক একটা ফাটতে লাগল, আর ধ্বংস হতে লাগল। এই অবসরে প্রধানরা কেউ কেউ বলল, কোন এনিমি আমাদের এই সব্বোনাশ করল। কিন্তু সে শুধু বলা। সমস্ত কলোনী এই গোলাবারুদের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হতে লাগল। রাতের আকাশ যেন প্রলয় নৃত্য করে উঠল। কলোনীগুলির মানুষগুলি পালাবার আপ্রাণ চেষ্টায় ছুটোছুটি করে শেষকালে আগুনে প্রাণ দিল। চারিদিকে আগুন আর আগুন, তার সঙ্গে বারুদের ধোঁয়া। গোষ্ঠবিহারীও পালাবার জন্যে দূর্গের গম্বুজে উঠে পড়েছিল কিন্তু একটা গোলা এসে তাকেও ধরাশায়ী করল।

পরদিন দুপুরের পর যখন সব শেষ হল, দেখা গেল জীবিত মানুষের সংখ্যা খুবই কম। যারা জাহাজে করে পোর্ট গ্রাণ্ডিতে পালিয়েছিল তারাই শুধু বেঁচে আছে। এবার আমরা আমাদের নায়ককে একবার খুঁজি। হ্যাঁ গোষ্ঠবিহারী আছে কিন্তু জীবিত নেই। গম্বুজটি ভেঙে মাটিশায়ী হয়েছে। সে ঝুলে আছে একটা বাঁশের মাথায়।

পর্তুগীজ প্রধানরা তখন অনুসন্ধান করছে, কি ভাবে গোলাগুদোমে আগুন লাগল কিন্তু তারা একবারও গোষ্ঠবিহারীর দিকে তাকিয়ে দেখল না। দেখলে দেখতে পেত, সেই ছিন্ন মুখখানি ঘিরে কি তৃপ্তির হাসি। সে হাসি জয়ের। সে হাসি বাঁচার। গোষ্ঠবিহারী নিজে মরে বহু মানুষকে বাঁচিয়ে দিয়ে গিয়েছিল। কি ভাবে ? সেই ঘটনার পর পর্তুগীজরা আবার কলোনী তৈরী করেছিল কিন্তু মানুষ ব্যবসার ধরনটা একটু পালটে দিয়ে। অতো অত্যাচার করে আর মানুষের প্রাণ কেড়ে নিত না। দেশের লোক জানল না এর পিছনে কার দান। কে তাদের এই অত্যাচার থেকে বাঁচাল ? এমনি কত সাধারণ মানুষ কত বড় ঘটনা ঘটিয়ে ইতিহাসের কত কিছু উলটে দেয়, ইতিহাসও যেমন তাদের কথা বলেনা, আমরাও তাদের বাতিল বলে গণ্য করি।

●